যৌনদাসী না যৌনশ্রমিক

উৎস মানুষ বিশেষ সংখ্যা ২০০৫

অগাস্ট '০৫ ISSN 0971- 5800

বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকমন্ডলী
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণ্যব্রত গুণ, জয়ন্ত দাস,
পার্থপ্রতিম পাল, শর্মিষ্ঠা রায়

সূচীপত্র

১) সাক্ষাৎকার -- স্মরজিৎ জানা ২ \\ দেবপ্রিয় মল্লিক ৪ \\ তসলিমা নাসরিন ৬ \\ সুজাত ভদ্র ৭
২) অভিমত -- রমাকান্ত চক্রবর্তী ৯ \\ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১০
৩) এ লড়াই বাঁচার লড়াই - অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ১২
৪) 'এ লড়াই আমাদের জিততেই হবে ' - দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি ১৭
৫) গণিকার অধিকার - সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩
৬) নগ্ন নির্লজ্জ হাত - অহনা মল্লিক ২৭
৭) বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাস - পার্থপ্রতিম পাল ৩৬
৮) যৌনদাসী - বাণী বসু ৪২
৯) যে পথে সম্ভব হয়েছিল - পুণ্যব্রত গুণ ৪৭
১০) পতিতাবৃত্তির আইনী স্বীকৃতি কেন অনুচিত (অনুবাদ) - জেনিস জি. রেমন্ড ৫১
১১) আমি দীপালি বলছি - স্বপন দাস ৫৭

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

সাক্ষাৎকার ঃ ডা. স্মরজিত জানা

নিয়েছেন ঃ শর্মিষ্ঠা রায় ও পার্থপ্রতিম পাল

প্রঃ যেসব মহিলা অর্থের বিনিময়ে যৌনক্রিয়ায় আছেন, তাঁদের নিয়ে সংগঠন করছেন আপনি । তাঁদের নতুন অভিধা দিয়েছেন যৌনকর্মী । এমন একটা পেশা সমাজ থেকে বিলুপ্ত করার আন্দোলন না করে এর স্বীকৃতির দাবিতে আপনারা এগিয়ে এলেন কেন ?

উঃ কোনো পেশার জন্ম, মৃত্যু, কোনো মানুষ, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না । এই কাজ আদিম যুগ থেকে চলে আসছে, একে কেউই বন্ধ করতে পারে নি । গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে বহু মানুষ এ পেশাকে বন্ধ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সফল হননি । রাষ্ট্র আইন করে একে নিন্ত্রয়ণ করতে পারে, বেআইনী ঘোষণা করতে পারে কিন্তু বন্ধ করতে পারে না । আমাদের মত দেশে অস্পষ্ট আইন দিয়ে একে আধা-নিষিদ্ধ বা প্রায় অপরাধের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । বাজার এর গুণমান নির্ধারণ করে দিতে পারে । এর ফলে যৌনপল্লী নিষিদ্ধ হলে তা ম্যাসাজ পার্লার বা অন্য কোন চেহারায় সমাজেই থেকে যাবে, পেশা হারিয়ে যাবে না । এটা দশ হাজার বছরের অভিজ্ঞতা ।

প্রঃ এরকম একটা পেশাকে আইনী স্বীকৃতি দিলে এদের মধ্যেকার দালাল শ্রেণীরই সুবিধা হচ্ছে না কি ? যৌনকর্মীরা থার্ড পার্টিতে পরিণত হচ্ছেন না কি ?

উঃ যৌনতা ব্যাপারটাকে ঠিক ওভাবে জানার সমাজে কোনো ব্যবস্থা নেই । আমরা নতুন কোনো আইন গড়ে আইনী স্বীকৃতির কথা বলি না । এটা আপরাধমূলক কোন কাজ হিসেবে যাতে গণ্য না হয় তার জন্য বর্তমান আইনের বিলুপ্তি দাবী করছি । ভারতবর্ষে পেশার একটা তালিকা আছে । সেই তালিকায় একে আনতে বলা হচ্ছে । চুরি-পকেটমারি-রাহাজানির মত অপরাধমূলক কাজের মতই একাজকেও দেখে রাষ্ট্র । দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি গত পাঁচ বছর ধরে এই দাবি করে আসছে যে, যৌন পেশাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেখনে কেবলমাত্র সরকারি

প্রতিনিধি নন, এই পেশায় অন্তর্ভুক্ত মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে । যেমন আইন পেশায় যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল আছে । সবচেয়ে ভালো হত, যদি নিজেদের সমস্যা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে পেশাজীবীদের স্বশাসিত বোর্ড একাই সিদ্ধান্ত নিতে পারত ।

আপনার প্রশ্নের আর একটি অংশ হল মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ে, **আর পাঁচটা ব্যবসার মত এরাও থাকবে । এদের শেষ করে দেওয়া যাবে না ।** তবে, আমরা এটা দেখে থাকি, যাতে এরা যা খুশি তাই না করতে পারে । **এখন যেমন সোনাগাছি এলাকার সত্তর শতাংশ মেয়েই self employed, তারা নিজেরা ঘর ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালায় । এবং মালকিনরা কত শতাংশ যৌনকর্মীর রোজগারের ভাগ পাবেন তা এই কর্মীরাই নির্ধারণ করে দেবেন ।**

প্রঃ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে এ পেশা নিষিদ্ধ নয় । আপনাদের আন্দোলন কি তাঁদেরই ধারার অনুসারী, নাকি কিছু নতুনত্ব আছে ?

উঃ নতুনত্ব একটাই, সেল্‌ফ রেগুলেটরী বোর্ডের প্রশ্নটা দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটিই প্রথম তুলেছে । এটা ঠিকই, পৃথিবীর অনেক দেশেই এ পেশা decriminalized হয়েছে, সেখানে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও অনেকে ব্যবসা করছেন ।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন, আর পাঁচটা পেশার মত যৌন কাজকেও ক্যারিয়ার অপশান হিসাবে নেওয়া যেতে পারে?

উঃ প্রথমত যৌনকর্মীরা যে কাজ করছেন সেকাজের জন্য প্রাপ্ত টাকার থেকে কতটা টাকা বিভিন্ন ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং কতটা টাকা শেষ পর্যন্ত নিজেদের হাতে রাখতে পারছেন, তার ওপরেই নির্ভর করবে যে এটা ক্যারিয়ার অপশান হিসেবে নেওয়া যেতে পারে কি না । দ্বিতীয়ত এই পেশার প্রতি যে ঘৃণা ও বৈষম্যমূলক আচরণ সমাজে রয়েছে তা পাল্টে গেলে অনেকে হয়ত এটিকে ক্যারিয়ার হিসেবে নেবেন ।

প্রঃ ধরা যাক, আপনাদের আন্দোলনের ফলে দালাল-মাসি, মাস্তান-গুন্ডাচক্র, পুলিশ-তোলাবাজদের জুলুম

অনেকটাই প্রশমিত হয়ে গেল । এই অবস্থায় একজন যৌনকর্মী মা কি নিজের মেয়ের জন্য এ পেশাকে বেছে নেবেন ?
উঃ একজন যৌনকর্মী মা হিসেবে আর পাঁচজন মায়ের মতই । তিনি তাঁর সন্তানের জন্য একজন সাধারণ মা যেভাবে ভাববেন, তিনিও সেভাবেই ভাববেন । আপনি কি ভাবতে পারেন আপনার মেয়ে পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ বা ধোপানীর কাজ করবে ?

প্রঃ একই প্রশ্ন যদি আপনাকে রাখা হয় যে, এ পেশার স্বীকৃতি হলে আপনার সন্তানের জন্য কি আপনে এ পেশা বেছে নেওয়ার কথা ভাবতে পারবেন ?
উঃ যৌন পরিষেবার পরিধিকে কোনো গন্ডির মধ্যে বেঁধে দেওয়া যায় না । পর্দায় মাধুরী দীক্ষিত নাচছেন, সেটাও কোনো দর্শককে যৌন পরিতৃপ্তি দিচ্ছে । আমার বাবার সময়ে কোন পিতা ভাবতে পারতেন না যে, তাঁর মেয়ে মডেল হোক । আর আজ, মেয়েকে মডেল তৈরি করা বা বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য মা-বাবারা আগ্রহের সঙ্গেই ভাবছেন । আমাদের দেশে কোনো ছেলেমেয়ে হোটেল ওয়েটারের কাজ করবে এমন স্বপ্ন দেখে না । কিন্তু বিদেশে এটা খুব সাধারণ ব্যাপার । ফলে এটা দেশকাল ভেদে পরিবর্তিত হয় । **এ পেশায় অত্যাচারের দিকটা কমে এলে এবং সামাজিক স্বীকৃতি পেলে একদিন এমন সময় আসতেই পারে, যেদিন আমিও আমার সন্তানের জন্য এ পেশায় আসার কথা ভাবতে পারব ।**

প্রঃ সবই মানলাম । তবু, এ পেশায় অসম্মান আছে, অসম্ভ্রম তো আছেই .....
উঃ অনেকেই ভাবছেন এ পেশায় একটা মূলগত অসম্ভ্রম আছে । কিন্তু, এটা ঠিক নয় । আমি যদি আমার কাজের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতি না করে আনন্দ দিই, তা হলে তা আমার অসম্মানের কারণ হবে কেন ? একজন শিক্ষক টাকার বিনিময়ে ছাত্রকে শিক্ষা দেন । একজন ডাক্তার অর্থের বিনিময়ে রোগীকে চিকিৎসা দেন । তেমনি, একজন যৌনকর্মীও টাকার বিনিময়ে ক্লায়েন্টকে যৌন পরিতৃপ্তি দিচ্ছেন । এটা এক ধরনের পরিষেবা ছাড়া তো কিছু নয় ।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন, একজন যৌনকর্মী মনে করেন না তিনি প্রতিদিন ধর্ষিতা হচ্ছেন .....
উঃ **যৌনকর্মীদের কেউই মনে করেন না যে তাঁরা ধর্ষিতা হচ্ছেন । উল্টে তাঁরা পরিবারে, বা সমাজে ধর্ষিতা হয়েই একাজে আসেছেন ।** এখানে তাঁরা ক্লায়েন্টকে না করতে পারেন, জোর দেখাতে পারেন, এখানে তাঁর একটা **নিজস্ব জায়গা আছে , যেটা সাধারণভাবে পরিবারের চৌহদ্দীতে থাকে না ; সেখানে স্বামী এবং পুরুষমানুষেরা কখন কিভাবে কেমন যৌনসঙ্গম করবেন তার প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করেন ।**

প্রঃ একটা কথা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় যে, এই যৌনপল্লীগুলোকে বাঁচিয়ে না রাখলে সমাজে ‘ধনঞ্জয়’দের সংখ্যা বেড়ে যাবে । মানুষের কুৎসিৎ প্রবৃত্তি লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য এই পল্লীগুলোর প্রান্তিক মানুষদের ঠেলে দেওয়া -- কতটা মানবিক ?
উঃ আমরা এমন কথা বলি না । এটা আর পাঁচটা পেশারই মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা । আপনার প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বাজার থেকে চাল কিনে খেতে যদি আপত্তি না থাকে, তবে অর্থের বিনিময়ে যৌনতার কেনাবেচায় আপত্তি থাকবে কেন ? পৃথিবী থেকে বাজারের ধারণা যদি উঠে যায়, তাহলে এ পেশা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে ।
প্রঃ যেসব মহিলা যৌনকর্মী স্বেচ্ছায় এই পেশায় আসেন, তাঁদের তুলনায় চক্রান্ত, দালালের চাপ, মিথ্যা ভালোবাসার টোপ ও পারিবারিক কারণে আসা যৌনকর্মীদের মোটামুটি অনুপাত কি রকম ?
উঃ প্রোজেক্ট যখন শুরু হয়েছিল, তখন অনিচ্ছায় আসা মহিলাদের সংখ্যা ছিল ২৫ শতাংশ মতো ।১৯৯৯ সালে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি নীতি হিসেবে নিয়েছিল যে, বলপূর্বক এ পেশায় মেয়েদের আনা বন্ধ করতে হবে । অনিচ্ছায় যে মেয়েরা এ পেশায় এসেছিল তাদেরকে তারা ভারতের মানবকল্যাণ মন্ত্রকের সাহায্যে বিভিন্ন হোমে বা বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে । এখন যাঁরা আছেন তাঁদের ১/২ শতাংশ মহিলা অনিচ্ছায় এ পেশায় যুক্ত আছেন ।

প্রঃ দুর্বার তো দীর্ঘদিন ধরে যৌনপল্লীগুলোতে কন্ডোম ব্যবহার বা এড্স সম্পর্কে সচেতনতার ব্যাপারে কাজ করছে । এই পল্লীগুলোতে এড্সের হার এখন কেমন, বা আক্রান্তদের বিষয়ে আপনারা কী করছেন ?
উঃ পশ্চিমবঙ্গের যৌনপল্লীগুলোতে এইচ. আই. ভি-র হার স্টেবল হয়ে গেছে । কমে গেছে বলা যাবে না, কারণ,

যাঁরা আক্রান্ত তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন রোগীর সংখ্যা একই থাকবে । অন্য রাজ্যের কথা আমরা বলতে পারি না । মুম্বাই, হায়দরাবাদ-এর চিত্র অন্যরকম । তাদের মধ্যে এইচ. আই. ভি-র হার ৬০-৭০ শতাংশ। আসলে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি যৌনকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর সঙ্গে এড্স বিরোধী আন্দোলনটাও একইভাবে করে চলেছে । যাঁরা এইচ. আই. ভি.(+) হচ্ছেন, তাঁদের স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন বা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হচ্ছে । কিছুজনকে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপিও দেওয়া হচ্ছে । দুর্বার পশ্চিমবঙ্গে সাতচল্লিশটা ক্লিনিকে এঁদের চিকিৎসা করে চলেছেন । আক্রান্তরা এ পেশায় থাকবেন কিনা, সেটা ঠিক করার দায়িত্ব এঁদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে । আমরা তাঁদেরকে এই পেশা ছেড়ে অন্য কাজে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকি । তাঁদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া এবং দুর্বার নিয়মনীতি গড়ে তাঁদের সংগঠনের ১০ শতাংশ কাজ এইচ. আই. ভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত করেছেন । ফলে এঁদের অধিকাংশ প্রজেক্টে কাজ করেন এবং কিছুজন নিজের বাড়িতে ফিরে গেছেন ।

সাক্ষাৎকার ঃ ডা . দেবপ্রিয় মল্লিক

নিয়েছেন ঃ শর্মিষ্ঠা রায়

প্রঃ নেশাগ্রস্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং এডস্ রোগ প্রতিরোধ, রোগ চিকিৎসা ও রোগীদের পুনর্বাসনে আপনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন । দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি রকম ?
উঃ দুর্বারের জন্ম থেকে আমি আছি । ওঁদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার যথেষ্টই ভালো ।

প্রঃ যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার এক দাবি ১৯৯৮ সাল থেকে দুর্বার তুলে ধরেছে । আপনি কি এই দাবির সঙ্গে একমত ?
উঃ যৌনকর্মীদের বিষয়ে ওঁদের যে দাবিগুলো আছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ওঁদের নাগরিক অধিকার, বা মানুষের মত বাঁচার অধিকার । ওঁদের লড়াইয়ের প্রতিটি ইঞ্চিতে আমি ছিলাম, আছি এবং থাকবও । এঁরা তো মনুষ্যেতর কোনো প্রাণী নয় । মানুষ হিসেবে সভ্য জগতে যে সমস্ত অধিকার ভোগ করার কথা, যেমন বাচ্চাদের স্কুলে কলেজে পড়ানোর অধিকার বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিজের নামে খোলার অধিকার , এঁরা লড়াই করেই অর্জন করেছেন । আমাদের দেশে তো অনেক ধরনের মজার ঘটনা ঘটে -- যেমন ধরুন, এঁরা যদি কোনো হল ভাড়া করে অনুষ্ঠান করতে যান, তাহলে বেশ কিছু হল আছে, যারা এঁদের ভাড়া দেবে না । অথচ, এই সব হলে দেশের কলঙ্কিততম রাজনৈতিক নেতা - যাঁদের নামে জনগণের কোটি কোটি টাকা চুরির অভিযোগ আছে, তাঁরাও বাধা পান না । তো, এই ধরনের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধেও তাঁরা অধিকার অর্জনের সংগ্রামে নেমেছেন । তাছাড়া বাড়িওয়ালি, মস্তান, পুলিসের বিরুদ্ধে ওঁরা যে লড়াই চালান, তা ওঁদের দৈনন্দিন জীবনের লড়াই, বেঁচে থাকার অধিকারের লড়াই । এসব লড়াই যে তাঁরা কোনো রাজনৈতিক দিশা থেকে করছেন তা নয়, করছেন বেঁচে থাকার জন্যই । মেয়েদের উপরে এমনিতেই চার পাহাড়ের শোষণ । এই মেয়েরা তার বাইরে নন । যে মেয়েটি এই পেশায় ঢুকে পড়েছে , তার প্রতিবাদ প্রতিরোধের জায়গাটাকে আমি সমর্থন করি ।

প্রঃ কিন্তু 'দুর্বার' তো পেশাটাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে .....
উঃ দেখুন, যারা যে দাবি তোলে, তা তাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকেই তোলে। দাবি তোলার অধিকারে তো হস্তক্ষেপ করা যায় না । এখন আপনি যদি দুর্বারের মেয়েদের ইন্টারভিউ করেন তাহলে হয়তো দেখবেন, ওঁরা ভাবছেন ওঁরা বেঁচে থাকার অধিকার ফিরে পাবেন, এ জীবন থেকে মুক্তি পাবেন । কিন্তু, এ ধারণা একেবারেই সঠিক নয় । যদিও এ নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু এঁদের মুক্তির একমাত্র রাস্তা হচ্ছে বস্তুবাদী দর্শনের আলোয় মার্কসবাদী লেনিনবাদী ও মাও সে তুং চিন্তাধারায় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল, তাঁদের দেখানো পথে ; একমাত্র সেখানেই তাঁরা এই সমস্যাকে নিখুঁত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাধান করেছিলেন । চিনে মুক্তিযুদ্ধের আগে সাংহাইতে দশ লক্ষ মেয়ে দেহব্যবসায় যুক্ত ছিল । চিনের মুক্তির পরে সাংহাই শহরের এইসব মেয়েরা কিন্তু সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি করার কাজে অংশগ্রহণ করেছিল । পৃথিবীর সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসগুলো দেখলে দেখা যাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে কিছু লোক এই বিষয় নিয়ে নানারকম কথাবার্তা বলছে, বা

নানাভাবে করে খাচ্ছে । ডা. বেথুনের কথায় এদের কাজ হল কাঠের পায়ে প্লাস্টার দেওয়ার মত। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী বা আমাদের মত দেশগুলি কোনদিনই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, বা পারবে না, এটা প্রমাণিত । উপরন্তু, ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য ওরা এই মেয়েদের পাঠিয়েছে । সাম্রাজ্যবাদীরাই তো তাদের কালচারে ফ্রি সেক্সের আমদানি করেছে । ওদের রক্তের মধ্যে রয়েছে এসব । ওরা এ ব্যবস্থা বন্ধ করতে যাবে কোন দুঃখে ! একমাত্র স্ট্যালিন ও মাও সে তুং সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সময় এঁদের অর্ধেক আকাশের মর্যাদা দিয়েছেন । আর অন্য যা কিছু কাজ হচ্ছে, তা থোড়-বড়ি-খাড়া ছাড়া আর কিছু নয় ।

প্রঃ কিন্তু এ ধরনের দাবির চেয়ে পেশার স্বীকৃতি বা লাইসেন্সের দাবিই তো শোনা যাচ্ছে .....
উঃ দেখুন, যে মেয়েটি বলছেন পেশার লাইসেন্স পেলেই তিনি মুক্তি পাবেন, একথা তিনি নিজে বলছেন না, এটা কেউ তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছে । রাষ্ট্রকাঠামোর মুক্তির সাথে এঁদের মুক্তি জড়িয়ে আছে । এই পরিষ্কার কথাটা ওঁদের মাথায় ঢোকাতে হবে । Structure না পাল্টালে superstructure পাল্টাবে না । আপনি আমায় বলুন, একটা কো-অপারেটিভ করলেই ওঁরা মুক্তি পেয়ে যাবেন, নাকি ওঁদের বাচ্চাদের হোম করে দিলেই তাঁরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন ?

প্রঃ সবই তো বুঝলাম । ওঁদের বোঝাবার এই দায়টা তাহলে কার ? যেখানে ওঁদের দুর্ভাগ্যকে মূলধন করে অনেকেই করে খাচ্ছে .....
উঃ এ দায়টা একেবারেই যাঁরা মার্কসবাদী লেনিনবাদী ও মাও সে তুং-এর চিন্তভাবনার প্রয়োগে বিশ্বাস করেন, তাঁদের । আমি তো একজন ডাক্তার । মাও সে তুং শিখিয়েছেন, রোগ আর রোগী দুটো আলাদা । আমাদের কাজ রোগকে সারিয়ে রোগীকে বাঁচানো । এঁদের পেশাটাই তো সমাজের দগদগে রোগের চিহ্ন বহন করছে । তো তাকে গৌরবান্বিত করে যারা ভাবছে এঁদের মুক্তি আসবে তারা সম্পূর্ণ বেঠিক চিন্তা করছে । এ পেশাকে কোনোভাবেই গৌরবান্বিত করা যায় না ।

আমাদের মধ্যে যাঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছেন, **যাঁরা রাজনীতিগতভাবে সচেতন, তাঁদের উচিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করা । এঁদের মুক্তির লড়াইয়ে এক এবং একমাত্র পথ এটাই ।** পেশাকে আইনি স্বীকৃতি দিয়ে, decriminalise করে কোনোদিন এঁদের মুক্তি আসেনি, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রনায়ক এমন দাবি করতে পারবে না । যে লোকটা আমেরিকায় বসে বড় বড় কথা বলছে -- ওই সাম্রাজ্যবাদীদের পান্ডা, বুশ, ওরা ওদের পবিত্র হোয়াইট হাউসের ওভাল রুমের ঘরটাই ব্যবহার করেছিল এই কর্মকান্ডের জন্য । সুরক্ষার সর্বোচ্চ ঘেরাটোপের মধ্যে বসেই বিল ক্লিন্টন মনিকা লিউনস্কির সঙ্গে ন্যক্কারজনক কাজকর্ম করেছিল। এমন ঘটনা যারা ঘটায়, তারা কোন্ অধিকারে এ পেশার বিলোপ চাইবে ?

প্রঃ যারা তাহলে আন্দোলনের জন্য এঁদের সংগঠিত করছে, তারা আসলে কাদের স্বার্থ চরিতার্থ করছে ? এদের অনেকেই একদা মার্কস লেনিন মাও-এর রাজনীতিতে বিশ্বাসী .....
উঃ শুনুন, এঁদের আরও অনেক বেশি পড়াশুনা করা দরকার । রেডবুকের 'অধ্যয়ন' অধ্যায়ে মাও বলেছেন -'কিছু কিছু লোক কয়েকখানা মার্কসবাদী পুস্তক পড়েছেন তো নিজেদের মস্ত পন্ডিত ঠাওরান, কিন্তু তাঁরা যা পড়েছেন তা' তাঁদের মাথায় ঢোকেনি এবং মগজের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেনি, তাই তাঁরা তা' ব্যবহার করতে জানেন না, ...। আরো কিছু সংখ্যক লোক ভয়ানক অহংকারী এবং কয়েকটি কেতাবী বুলিতে শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে সবজান্তা মনে করেন, লেজ ফুলিয়ে আকাশে তুলে ধরেন,.....।' এই লোকগুলি মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেননি, এবং এই সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশের মেয়েদের মুক্তির লড়াইয়ের ইতিহাসের অ-আ-ক-খ পর্যন্ত জানেন না । আমার মনে হয়, আনাকে লেখা লেনিনের চিঠি এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারে ।

প্রঃ এর পরেও দুর্বারের সঙ্গে আছেন আপনি । আপনার অবস্থানটা ওখানে কিরকম ?
উঃ দুর্বারের মেয়েদের প্রতিদিনকার লড়াইয়ে ওঁদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর নাম ডা. দেবপ্রিয় মল্লিক । কিন্তু ওদের মুক্তি সংক্রান্ত প্রশ্নে এটা আমার মতাদর্শগত পার্থক্য । মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী মানুষ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় । সেই জায়গা থেকে আমি এঁদের পাশে আছি ।

প্রঃ আপনি তো ওঁদের কাছের বন্ধু । শুভাকাঙ্খী । ওদের মুক্তির জন্য কিছু ভাবেন ?

উঃ দেখুন, যাঁদের সঙ্গে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে কাজ করা চলতে পারে, কিন্তু আপোষ করা চলে না । স্মরজিৎরা ওঁদের জন্য কো-অপারেটিভ করেছেন বা বাচ্চাদের জন্য হোম করে দিয়েছেন , এ তো নি:সন্দেহে ভালো উদ্যোগ । আর আজ যে ট্রেড লাইসেন্সের প্রশ্ন উঠছে, সেখানে তো পৃথিবীর ইতিহাস থেকে প্রমাণিত তথ্যটা আপনাকে বলেইছি, এর কোনো কর্ড লাইন হয় না । তাছাড়া কর্মসূত্রে ওঁদের সঙ্গে খুব একটা সংশ্লিষ্ট নই । ওঁদের সঙ্গে এড্স দূরীকরণের বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে আমার যোগ । এই কাজটাই ওঁদেরকে আন্দোলনের সামনের সারিতে এনেছে । তারপর কাজ করতে করতে ওঁরা empowerment -এর তত্ত্বটা হাজির করেন ..... ।

ভারতবর্ষের মেয়েদের ওপর যে পাহাড়ের শোষণ জারি রয়েছে, তা কোনো যাদুমন্ত্রে উঠে যাবার নয় । একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম প্রয়োজন এর জন্য । কোনো এক সুন্দর সকালে আপনি উঠে দেখলেন সোনাগাছির সব মেয়েদের উপর থেকে শোষণ উঠে গেছে, ব্যাপারটা এরকম নয় মোটেই । এটা শোষণমুক্তির ইতিহাসকেও মান্য করে না । একেবারেই কল্পকথা । গল্পটা এমনই, মাসীর যদি গোঁফ গজায় তাহলে মাসীকে মামা বলা যাবে কি না -- তেমনি empowerment হলে সোনাগাছির মেয়েদের ওপর থেকে অত্যাচার কমে যাবে কিনা একই ধরনের ব্যাপার । দুর্বারের মেয়েরা তো আর আকাশ থেকে পড়েননি, তাঁরা আমার বাড়ির বোন, বা আমারই গ্রামের মেয়ে । আসলে empowerment ব্যাপারটাকে বোঝাতে একটা গল্প বলি । একজনকে আপনি পায়ে শিকল দিয়ে ছোট একটা ঘরে বেঁধে রেখেছেন । সে প্রচুর চেঁচামেচি করল বলে আপনি শেকলটা খুলে বলে দিলেন, তুমি এই ঘর আর বারান্দার বাইরে কোথাও যেতে পারবে না । অর্থাৎ, শোষণ একই রকম বজায় থাকবে, শুধু একটু ছাড় দেওয়া হল । তাতে ক্ষোভটাও একটু কমল । এটা একটা চাল । আসল empowerment সেটাই, যেদিন ওঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা লড়তে পেরেছিলাম । আজ এই মেয়েদের কাছে যে empowerment- এর গল্প বলা হচ্ছে তা দুধের বদলে পিটুলি গোলা খাওয়ানোর গল্প ।

সাক্ষাৎকার ঃ তসলিমা নাসরিন

নিয়েছেন ঃ শর্মিষ্ঠা রায়

প্রঃ আজকাল অর্থের বিনিময়ে যৌন পেশায় যাঁরা যুক্ত তাঁরা স্বীকৃতির দাবিতে সংগঠিত হচ্ছেন । এ বিষয়ে আপনি কি বলেন ?

উঃ পেশার স্বীকৃতি ! সেটা কে দেবে ? সরকারের কাছে স্বীকৃত বা স্বীকৃত নয় এমন পেশার কোনো লিস্ট আছে নাকি ? নাকি স্বীকৃতি দানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ আছেন ? এটা একটা vague term, নথিবদ্ধ অবস্থায় কোথাও কিছু নেই । এদেশে জাতিভেদপ্রথা আছে । মেথরের পেশাও অবজ্ঞাত হয় কোনো শ্রেণীর কাছে, তবু এ পেশা পুরুষ বা নারী কারো একার জন্য নির্দিষ্ট নয় । কিন্তু প্রস্টিটিউশন বহু যুগ ধরে নারীর জন্যই নির্দিষ্ট । দারিদ্র্যের কারণে নারীকে শিকার বানিয়ে এ পেশা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কুৎসিততম রূপকেই প্রকট করে । এ সমাজে নারী যে ভোগ্যবস্তু ও সম্পত্তি হিসেবেই এখনও ব্যবহৃত হয়, তার চরম প্রকাশ এই পেশাকে জিইয়ে রাখার জন্য এত উৎসাহ । নারী যতদিন স্বনির্ভর না হবে, যতদিন পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমমর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিনই প্রস্টিটিউশন থাকবে সমাজে । দারিদ্র্যের শিকার তো পুরুষও । কিন্তু পুরুষকে তো একারণে এই পেশা বেছে নিতে হয় না ।

প্রঃ কিন্তু, এই পেশাজীবীরা তো তাঁদের আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের চিন্তার গতিমুখ ঘুরিয়েও দিতে পারেন । এমন দিন আসতেই পারে, যেদিন এই পেশা সম্পর্কে মানুষের অশ্রদ্ধা কমে আসবে .....

উঃ এ পেশাকে শ্রদ্ধা করার কি আছে ? **মেয়েরা পুরুষের লালসার শিকার হবে আর সেটাকে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হবে , এ কেমন কথা ? এটা পৃথিবীর আদিমতম, ঘৃণ্যতম পেশা ।** তাছাড়া স্বীকৃতির বিষয়টা অন্য ভাবেও দেখা যায় । এই সমাজের পুরুষরাই সোনাগাছিতে যায় । তারাই তো স্বীকৃতি দিচ্ছে । বহু প্রাচীনকাল থেকে । আপনার মত একজন সাংবাদিককে অস্বীকার করা যায়, একজন অন্য পেশাজীবীর কাজকে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু সোনাগাছিকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না । ক্লায়েন্টরা জানে, ওখানে গেলে নারী শরীর পাওয়া যাবেই । নতুন করে আর কোন

স্বীকৃতি চায় ওরা ? পেশা হিসেবে এত বেশি দিন ধরে এত স্বকৃতি আর কোন পেশা পায়নি । বহু পেশা সময়ের প্রবাহে বিলুপ্ত হয়ে যায় । কিন্তু এটা বিলুপ্ত হয়নি । **কারণ, যতদিন পুরুষতন্ত্র থাকবে, ততদিন এ পেশা থাকবে । কিন্তু আমরা পুরুষতন্ত্রকে আর বেশিদিন টিকে থাকতে দেবো না ।**

প্রঃ ওঁরা তো শ্রমিকের মর্যাদা চাইছেন । আপনি কি এ দাবি যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না ?
উঃ কার কাছে চাইছে ওঁরা শ্রমিকের মর্যাদা ? এরা নিজেদের যতই শ্রমিক বলে দাবি করুক সমাজ জানে এরা বেশ্যার কাজই করছে । তকমা বদলালেই কি পরিবর্তন ঘটে যাবে ? মেথরের কাজকে জাতিভেদাশ্রিত সমাজ শ্রদ্ধার চোখে না দেখলেও সেটা শ্রমিকের কাজ । কিন্তু বেশ্যাবৃত্তির কখনও এরকম ব্যাখ্যা হতে পারে না ।

প্রঃ আপনার কি মনে হয়, আইনি স্বীকৃতি পেলে এদের ওপর অত্যাচার কমবে ?
উঃ আমরা কি ইউটোপিয়ার স্বর্গে বাস করছি নাকি ? তবে **স্বীকৃতি পেলে একটা ক্ষতি হবে । প্রচুর মেয়ে দারিদ্র্যের কারণে আরো বেশি করে এ পেশায় আসবে ।** যে কোনোভাবেই এ পেশাকে টিকিয়ে রাখা বা গ্লোরিফাই করার বিরুদ্ধে আমি । সচেতন নারী পুরুষ যখন এই ক্ষতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন এই জঘন্য বিষয়কে স্বীকৃতি দেওয়া কখনই সম্ভব নয় ।

প্রঃ আন্দোলনকে তো সমর্থন করেন না বুঝলাম, কিন্তু এই সব সমাজ পরিত্যক্ত সর্বহারা প্রান্তিক মানুষদের পুনর্বাসনের কথা কিছু ভাবেন ?
উঃ এ বিষয়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । বিভিন্ন সেক্টরে এদের involve করে যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত । vocational training-এর ব্যবস্থা করে ও অন্যান্য সম্ভাব্য কাজকর্ম শিখিয়ে এই বিশাল মানবসম্পদকে ব্যবহার করা উচিত রাষ্ট্রের ।

সাক্ষাৎকার ঃ সুজাত ভদ্র

নিয়েছেন ঃ শর্মিষ্ঠা রায়

প্রঃ বেশ্যা থেকে যৌনকর্মী । এই পরিবর্তন কি আপনার সামাজিক উত্তরণ বলে মনে হয় ?
উঃ যৌনকর্মী শব্দটি নতুন । এর একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট আছে । একে আগে বেশ্যাবৃত্তি বা পতিতাবৃত্তি বলা হত । এরা নিজেদের কর্মীতে রূপান্তরিত করেছে । বেশ্যাবৃত্তির মধ্যে একটা সামাজিক ঘৃণা যুক্ত ছিল । যৌনকর্মী শব্দটির মধ্যে সামাজিক মর্যাদা বা পেশাকে সম্মান দেওয়ার অভিব্যক্তি আছে । এটা আশাব্যঞ্জক ।

প্রঃ আপনার কি মনে হয়, নামের এই পরিবর্তন এই প্রান্তিক মানুষদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন আনবে ?
উঃ আমরা যদি খুব তাত্ত্বিক ভাবে দেখি তাহলে এটা দেখা যায়, বহু কিছু জিনিস আছে যা আইনের স্বীকৃতি পেলেও, তার বাস্তবিক সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি । দ্বিতীয়ত, নারীবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বা সমতার প্রশ্নে যৌনতাকে পণ্য প্রতিপন্ন করার বিরুদ্ধে আমি । এটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবে নারীকে দেখা । এটা বিকৃত কামনার ফসল বলতে পারেন । এদের দাবি এক অর্থে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে আঘাত করেছে । এরা সংসার সন্তান প্রতিপালন করেও অন্য পুরুষের লালসা মেটাবে ।

আর নামের প্রবর্তন বা আইনি স্বীকৃতি এদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না । এ পেশায় মেয়েদের জোর করে আনা হয় । স্বাধীন ইচ্ছায় এ পেশায় আসতে বা 'নিষিদ্ধ পল্লী'তে থাকতে কেউ চায় বলে আমার ধারণা নেই । এই কারণে, দুর্বার-এর প্রোজেক্টে সাহায্যকারি বহু বন্ধুর কাছ থেকেও শুনেছি যে, যে সমস্ত যৌনকর্মীকে সকালবেলা পড়ানো হত, তারাও এই পেশায় স্বাধীন ইচ্ছায় থাকার জন্য কোনো মত প্রকাশ করেনি । এমনকি, তাদের কন্যাদের এই পেশায় নিয়ে আসারও কোনো বাসনা পোষণ করেনি । কিন্তু যদি প্রশ্নটা এইভাবে আসে -- ''নিষিদ্ধ পল্লী'' আছে, 'ত্রুটিযুক্ত পিটা' আইন আছে, দালাল, আড়কাঠি, পুলিস, মাসীদের অত্যাচার আছে, সেক্ষেত্রে

যৌনকর্মীরা যদি প্রতিবাদে সংগঠিত হয়, এবং এইসব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে, তাতে আপত্তির কোনো কারণ নেই । বরং, তাতে পূর্ণ সমর্থন করাই উচিত আমাদের । তাদের সন্তানদের সামাজিক স্বীকৃতিও মর্যাদার চোখে দেখা উচিত । ঘৃণার চোখে নয় । মা'কেই অভিভাবক হিসেবে স্কুল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বীকার করে নেওয়া উচিত । একই সঙ্গে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে মেয়ে পাচার করে এই পেশায় আনাকে বিরোধিতা করা উচিত । এই পেশা থেকে মুক্ত করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সব ধরনের সুযোগ করা উচিত ।

তার জন্য রাষ্ট্রকে চাপ দেওয়া উচিত । যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের লেখাপড়া এবং অন্যান্য হাতের কাজ শেখানোও এই কারণে জরুরী, যাতে তারা অন্য পেশায় যেতে পারে । একটি আলোচনায় দুর্বারের সঙ্গে যুক্ত যৌনকর্মীরা জানালেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে তার জন্য 'দুর্বার' নানা সুযোগ তৈরি করেছে যাতে এই পেশায় থেকেও যৌনকর্মী ও তাঁদের সন্তানেরা সমাজে ভালোভাবে বাঁচতে পারেন । তবে আমি কখনোই এ পেশার আইনি স্বীকৃতির পক্ষে নই । কারণ আমি এমন অমানবিক পেশাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী নই । কেবল, যুগ যুগ ধরে এই প্রান্তিক মানুষদের ওপরে চলে আসা অত্যাচার, সন্ত্রাস ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের বেঁচে থাকার লড়াই ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিকে পূর্ণভাবে সমর্থন করি । পাশাপাশি এই পেশা থেকে সরে এসে সামাজিক সুবিধা ও সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের সন্তানদের অন্য নাগরিকের মত সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে আমি ।

প্রঃ পেশা আইনি স্বীকৃতি পেলে আসলে সুবিধাটা কারা পাবে বলে আপনার মনে হয় ?

উঃ **এ পেশা আইনি স্বীকৃতি পেলেও কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় একাজকে পেশা হিসেবে কোনদিনও নেবে না । সেহেতু আড়কাঠি, দালাল, মেয়ে পাচারকারী থাকবেই । জবরদস্তি করেই মেয়েদের আনা হবে ।** ফলে দমন-পীড়নের যাবতীয় উপকরণ যৌনপল্লীতে থাকবেই। আর আইনি স্বীকৃতি পেলে **সবচেয়ে উপকৃত হবে দালাল-আড়কাঠি-মস্তান বাহিনী ।** যে সমাজ এখনও নারীকেই সঠিক মর্যাদা দিতে শেখেনি, আইনি স্বীকৃতি পেলে এই প্রন্তিক নারীদের পূজনীয়া বলে গণ্য করবে বা তারা সামাজিক সুরক্ষা বা চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে যাবে, এমন কল্পনা দিবাস্বপ্ন দেখারই সামিল ।

অভিমত ঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী

গণিকাবৃত্তির ন্যায্য স্বীকৃতি বা ধর্ম্য অনুমোদন

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ গণিকা ধর্ম্য (legal) অনুমোদন পেয়েছিল । এ বিষয়ে যে তথ্য আছে, তার সংক্ষিপ্তসার এই রূপ ঃ

Providing sexual entertainment to the public using prostitutes (Ganika) was an activity not only strictly controlled by the State but also one which was, for the most part, carried on by state-owned establishments. Women who lived by their beauty (Rupajiva>) could entertain men as independent practitioners ..... The emphasis in the Arthasastra is on collection of revenue. The state enabled the setting up of establishments with lumpsum grants of 1000 panas to the head courtesan and 500 panas to her deputy, presumably to enable them to buy jewellery, furnishings, musical instruments and other tools of their trade. The madam ..... had to render all accounts and it was the duty of the Chief Controller of Entertainment to ensure that the net income was not reduced by her extravagance. Independent prostitutes ..... who were not required to produce detailed accounts, had to pay a tax of one-sixth of thier income. In times of financial distress both groups had to produce extra revenue with the independent having to pay half their earnings as tax.

[Kautilya, The Arthasastra, ed. LN Rangarajan, Penguin Books, New Delhi, 1992, p.63]

কৌটিল্য-কথিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বাত্মক এবং নির্মম শোষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত । এখানে রাষ্ট্রস্বার্থে গণিকাবৃত্তি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, এবং ধর্ম্য (Legal)। 'মৃচ্ছকটিক'-এর নায়িকা বসন্তসেনা এক সাধ্বী গণিকা, এবং অবশ্যই তাঁর পেশা ধর্ম্য । সংস্কৃত শ্লোকের অংশ 'দ্বিজনৃগণিকাপুষ্পমালা', এসবই সমৃদ্ধ রাজসভার অপরিহার্য অঙ্গ । গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের সময়ে রচিত 'চতুর্ভানী'-তে বর্ণিত, পাটলিপুত্রে এবং উজ্জয়িনীতে অবস্থিত গণিকালয় সুশোভিত, সুবিস্তৃত, উদ্যান-সমন্বিত, অত্যন্ত সমৃদ্ধ । অর্থাৎ গণিকাবৃত্তি প্রধানত ধনী অভিজাতবর্গ দ্বারা পোষিত এবং অতএব, অর্ধ-ফিউডাল রাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত । এসব তথ্য বিচার করে অবশ্যই বলা যায় যে, ভারতে গণিকাবৃত্তির ধর্ম্য অনুমোদনের প্রাচীন নিদর্শন আছে । সতীদাহের, কৌলীন্য প্রথার, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়ারও বহু প্রাগাধুনিক নিদর্শন আছে । প্রাগাধুনিক ঐতিহ্য মান্য হবে কী না - এটাই তো মৌল প্রশ্ন । এখন কেউ কেউ সোনাগাছি বা হাড়কাটাকে ধর্ম্য অনুমোদন দেওয়ার জন্য আন্দোলন করছেন । গণিকাকে বলা হচ্ছে যৌনকর্মী । কর্মাধিকার ভারতের শাসনতন্ত্র সম্মত, অতএব ধর্ম্য । এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি অস্পষ্ট ।

আমি গণিকাবৃত্তির অন্তর্নিহিত বঞ্চনা, মহাদুঃখ, গ্লানি, ভয়ানক শোষণ, এক কথায় গণিকাবৃত্তির যাবতীয় অমানবিক অনুষঙ্গ, যাবতীয় নির্দয়, নির্মম অসুন্দর মাত্রা, কিছুটা অনুমান করতে পারি । সেই মহিলাদের মহাদুঃখ কিছুটা অনুভব করতে পারি । কিন্তু প্রশ্ন, এই বিশেষ বৃত্তিকে ধর্ম্য (legal) অনুমোদন দিলেই কি এই মহিলাদের দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার অবসান হবে ? গুন্ডা, দালাল, ধর্ষকামী পশুপ্রবৃত্তিলাঞ্ছিত কামুক এই মহিলাদের উপরে নির্যাতন করবে না আর কখনও ? এই মহিলাদের নরকতুল্য বাসস্থান হয়ে উঠবে কি পাটলিপুত্রের ও উজ্জয়িনীর সুশোভিত, সুসমৃদ্ধ, উদ্যানশোভিত প্রাসাদ ? আমার তো এই ভয় হয় যে, গনিকাবৃত্তিকে ধর্ম্য অনুমোদন দিলে এই জটিল, ভোগপ্রবাহে নিমজ্জিত, অথচ দারিদ্র্যদুঃখময় সমাজে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায়, উপার্জনের আশায় বহু বহু বালা গণিকা হয়ে যাবেন, এবং গণিকাদের সংখ্যা ক্রমশ অত্যন্ত বেড়ে যাবে । যাঁরা গণিকাবৃত্তিকে ন্যায্য (lawful) করতে চান, তাঁরা এই সম্ভাবনা মস্তকাভ্যন্তরে রেখেছেন কি ? 'যৌনকর্মী' মানে যৌনশ্রম । অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত খেটে খাওয়া শ্রমিকদের সম্পর্কে যে সব আইন কানুন আছে, সেগুলো যে কতটা এবং কিভাবে এই জৈব বা Biological পেশা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতে পারে তাও তো অজ্ঞাত । এখানেও কি শ্রম-দিবস আট ঘন্টাই হবে ? যদি তাই হয় (অবশ্য কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী), তবে সেই পোড়াকপালী হতভাগিনীর জৈবিক সত্তা যে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে তা কি আদৌও ভাবা

হয়েছে ? **সরকারি নিয়ম মেনে, বিধি-নিয়ম মেনে, শৃঙ্খলা মেনে, লম্পট বাবু গণিকা গমন করবেন --- এটাই ধরে নেওয়া হচ্ছে কেন ?**

গণিকাবৃত্তিকে ধর্ম্য স্বীকৃতি দিলেই যে বিবিধ কার্যকারণে গণিকাবৃত্তিকে ধরে থাকা মহিলাদের দৈহিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক অবস্থা ভাল হয়ে যাবে, গণিকাবৃত্তি যে সংরচনাত্মক হয়ে উঠবে, এমন ভাবনার যুক্তিগুলো অদ্যাবধি দুর্বল । বরঞ্চ, অসহায়া, এবং মৌলিকভাবে নিরপরাধ ও নিষ্পাপ গণিকাদের স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে, ব্যাধির সুচিকিৎসা হয়, সন্তানদের সুশিক্ষা হয়, বিভিন্ন সৎ কর্মোদ্যোগে আয় বাড়ে, **বৃদ্ধা বেশ্যার শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তা যাতে রক্ষিত হয়, তার জন্য সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজনীয় ।** বারবধূদের অশ্রদ্ধা করার বা অবজ্ঞা করার অধিকার আমাদের নেই । অথচ, আমরা তাঁদের বিদূষণে যুগে যুগে মেতে রইলাম । গণিকাবৃত্তিকে ধর্ম্য অনুমোদন দিলেই কি আমাদের যুগে যুগে সঞ্চিত এই সংস্কার চলে যাবে ? গণিকা, অথবা এক মানবী, কি পণ্য বা Commodity? যাঁরা এমনটাই ভাবেন তাঁদের ধিক্কার জানাই ।

অভিমত ঃ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অতীব লজ্জজনক একটি ব্যবস্থা

বারবণিতার পেশাকে পৃথিবীর আদিমতম বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে । মনুষ্যসমাজের পক্ষে এটি অতীব লজ্জাজনক একটি ব্যবস্থা । কিন্তু বহুগামী কামুক ও লম্পট পুরুষদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে এই ব্যবস্থাটির প্রয়োজনও উপেক্ষা করা যায় নি । ব্যবস্থাটাকে বিলুপ্ত করার জন্য তেমন কোনও সক্রিয় উদ্যোগও লক্ষ্য করা যায় না । দু চারটি সমাজ ব্যবস্থায় সাময়িক চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু একেবারে দূর করা যায়নি ।

হিটলারের জার্মানীতে বা সমাজতান্ত্রিক কোনও কোনও দেশে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলেও শেষ অবধি ফলবতী হয়নি তা । অথচ বেশ্যাবৃত্তিকে কোথাও ভাল চোখে দেখা হয় না, সামাজিক দৃষ্টান্ত হিসাবেই এই বৃত্তির মূল্যায়ণ করা হয়ে থাকে । যদিও প্রগতির ঘন্টায় নারীর সতীত্বের দাম কমছে, হাফ গেরস্ত বা তথাকথিত ভদ্রসমাজের মেয়ে বউদেরও খানিকটা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান । এখন লক্ষণ এবং রকম সকম দেখে এবং নারী - মুক্তির বাঁধনহারা গতিবেগের ফলে অনেক সীমা ও ভেদরেখা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বা পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে । ফলে এমন দিন আসতেই পারে যখন বারবণিতা এবং গেরস্ত মেয়ে বউদের তফাৎ করা কঠিন হয়ে পড়বে, কারণ নারীবাদী অনেক মহিলাকেই প্রকাশ্যে বলতে শোনা যাচ্ছে তাঁরা পরপুরুষ-গমনকে তেমন দূষণীয় মনে করেন না ।
ইদানীং কিছু সমাজসেবীকে দেখা যাচ্ছে প্রায়ই তাঁরা রেডলাইট এলাকায় গিয়ে কিছু আদিখ্যেতা করছেন । দেহপসারিনীদের নিয়ে সভা করা, টিভিতে তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া, তাঁদের বাচ্চাদের জন্য দরদ দেখানো এসব কিন্তু মন্দ প্রয়াস নয় । কোন বুদ্ধিজীবীর মাথায় এসেছিল যে বারবণতাদের সেক্স ওয়ার্কার বা যৌনকর্মী নামে চিহ্নিত করলে তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস অন্যান্য শ্রমজীবীদের মতোই হয়ে দাঁড়াবে । গান্ধীজীও এইরকম মনোভাব নিয়ে সমাজের সাফাইকর্মীদের হরিজন আখ্যা দিয়েছিলেন । তাতে হরিজনরা উন্নীত হয়েছে না হরিজন শব্দটিরই অবনমন ঘটেছে তা বোধহয় বিচারের অপেক্ষা রাখে না । একটা তকমা এঁটে দিলেই কি দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় ? যৌনকর্মী কথাটার অর্থ যে বেশ্যা বা বারবণিতা সেটা কি লোকে বিস্মৃত হবে ?

কদিন আগে একজন বারবণিতা টিভির এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন, আজকাল নাকি ভদ্রঘরের মেয়ে-বউরা তাঁদের সঙ্গীদের সঙ্গে দেহমিলনের জন্য মোটা টাকা দিয়ে বারবণিতার ঘর কয়েক ঘন্টার জন্য ভাড়া নেন । এবং সেটা দুপুরবেলার দিকে । এসব খবর আমাদের উদ্বিগ্ন করে, বিপন্নও করে । চোরাগোপ্তা ব্যভিচার সমাজে চিরকালই ছিল

এবং আছে । হয়তো নানাকারণেই সংযমের বাঁধ ভেঙে যায় এবং নরনারী নিজের বৃত্তি প্রবৃত্তির প্ররোচনা রোধ করতে পারে না । কিন্তু সেই বারবণিতাটি মুচকি হেসে যা বললেন তাতে বোঝা গেল এইসব মহিলাকে তিনিও নিজের বৃত্তিরই একজন মনে করেন ।

বারবণিতাদের পাড়া হাড়কাটা গলির কাছাকাছি শ্রী গোপাল মল্লিক লেনে অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাসে আমি কিছুকাল ছিলাম । সেই বয়সেও বাইরে থেকে বারবণিতাদের যে জীবনযাত্রা দেখেছি তা অতিশয় বেদনাবহ । এইসব দেহজীবী মেয়েদের না জোটে পুষ্টিকর খাদ্য, সময়োচিত চিকিৎসা বা ন্যূনতম নিরাপত্তা । দেহ নিংড়ে যা ওরা রোজগার করেন তাতে ভাগ বসায় বাড়িউলি বা মাসি, গুন্ডা, মস্তান এবং আড়কাঠিরা । তদুপরি গুন্ডা বা পুলিশ বা ক্ষমতাশালীদের বিনা পয়সায় সেবা তো দিতে হয়ই । এঁদের অধিকাংশই অতি কুরূপা, মুখের চামড়া কর্কশ, সাজগোজ উগ্র এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এঁদের বাস, সকলের সবদিন খদ্দের জোটে না । তার ওপর মাতালের অত্যাচার, বৃদ্ধ সম্পর্কের আবদার এবং কখনও সখনও বালক বা কিশোর খদ্দেরের আবির্ভাবেও এঁরা জ্বালাতন বড় কম হননা ।

যদি সত্যিই এঁদের উপকার করতে হয় তবে আদিখ্যেতা বর্জন করে শক্ত হাতে এঁদের জন্য কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । অন্যায় কমিশন, মাত্রাতিরিক্ত ঘরভাড়া, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি দূর করা দরকার, বাঁচানো দরকার গুন্ডাদের হাত থেকে । অন্যায্য তোলা দিতে গিয়ে এঁরা ফতুর হয়ে যান, সামাজিক মর্যাদা নেই, নালিশ শোনার কেউ নেই, এঁদের অভিযোগ গুরুত্ব পায় না । পেটে বিদ্যে না থাকায় এঁদের দুর্দশা ষোলোকলায় পূর্ণ । যৌনকর্মী বললেই কি এঁদের মর্যাদা রাতারাতি বেড়ে যাবে ? আর দুচারটে সভাসমিতি বা টিভি প্রোগ্রামও এঁদের অন্ধকার জীবনকে কতটা উদ্ভাসিত করবে ?

মনে রাখতে হবে আমাদের সব সমস্যা সংকটের উদ্ভব ও উত্থান ঘটেছে দেশের অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতেই । এদেশের মেয়েরা পেটের টানেই দেহ-ব্যবসাতে নামতে বাধ্য হয় । ইচ্ছে করে নয়, আড়কাঠির নানা মিথ্যে প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়েও এরা দেহ ব্যবসার চক্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় । ছাপ্পা-মারা দেহপসারিনী ছাড়াও উচ্চবিত্ত সমাজের আশেপাশে সুন্দরী চতুরা বুদ্ধিমতী ইংরিজি বকুনি জানা মহিলাদেরও অভাব নেই । বার ড্যান্সার বা ক্যাবারে নর্তকীরাও আছেন, তবে এঁদের অবস্থা অনেক ভাল । মরতে মরে নিচুতলার দেহপসারিনীরাই ।

এ লড়াই বাঁচার লড়াই
এ দাবি কি বাঁচার দাবি ?

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

পতিতাবৃত্তি (প্রস্টিটিউশন)-কে স্বীকৃত পেশা বা ব্যবসা হিসেবে আইনী বৈধতা দিতে হবে - এ দাবির কথা উঠেছে সম্প্রতি, উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের যৌনকর্মী মহল থেকে । সত্যি বলতে কি, একজন সাধারণ বঙ্গদেশীয় মধ্যবিত্ত হয়ে, এরকম একটা দাবির কথা শুনলে প্রথমে শিউরে উঠতে হয় -- সে কি ! বেশ্যাবৃত্তি আর - পাঁচটা পেশার মত সমাজগাহ্য হবে নাকি ! ঘরের মা বোন মেয়েরা প্রকাশ্যে এই দেহব্যবসার লাইসেন্স পাবে ? তাহলে সমাজ উচ্ছন্নে যেতে আর বাকি থাকে কি !

জানি, এই শিহরণ এই বিস্ময় আমাদের অন্তরের ঐতিহ্য-লালিত সংস্কারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া । সমাজের সুস্থতা শুচিতা সৌন্দর্য সম্পর্কে যে ধারণা, যে মূল্যবোধ, প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের কালচারে রয়ে গেছে, সেখানে ধাক্কা লাগে, সর্বনাশের শঙ্কায় শঙ্কিত হই আমরা ।

তবু ভাবতে হয়, বিচার করে দেখতে হয় । এবং সে বিচার যেমন সংস্কারমুক্ত সহানুভূতিশীল মন নিয়ে করা দরকার, তেমনি সার্বিক যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতেও হওয়া দরকার, না হলে সত্যটাকে চেনা যায় না ।

সমাজে বারবণিতাদের অবস্থান বহু প্রাচীন কাল থেকে । পুরুষের বিকৃত যৌনকামনা, অতৃপ্ত বাসনা, উচ্ছৃঙখলতা আর অবৈধ আশ্রয়ের প্রয়োজনেই বারবণিতাদের সমাজের অন্ধকারে টিকিয়ে রাখা হয়েছে ।.... তবু কালের প্রবাহমানতা অনেক আলোড়ন ঘটায়, অনেক পরিবর্তন বয়ে আনে, যেমন হয়েছে এই পতিতাকুলের ক্ষেত্রেও ।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরা যাক । কবে কিভাবে যৌনব্যবসার সূত্রপাত হয়েছিল জানার উপায় নেই । চলে এসেছে ক্রমবর্ধমান হারে, মূলত দারিদ্র্য, অসহায়তা আর পুরুষের প্রবঞ্চনার হাত ধরে । **কোনো রমণীই স্রেফ মজা-ফূর্তির জন্য কিংবা তথাকথিত 'দুশ্চরিত্রা' হওয়ার কারণে বেশ্যাবৃত্তির লাইন-এ আসেনি ।** যদি বা কেউ বেহিসাবী প্রলোভনে কিংবা মিথ্যে আশ্বাসের ফাঁদে পড়ে এ ব্যবসার বৃত্তে চলে এসেছে, অচিরেই **সে এই নির্দয় নরকবাস ছেড়ে পালাতে চেয়েছে, পারেনি ।** মালিক-মাসী-মস্তানের চক্রব্যূহে আটকে পড়েছে ।

ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখে আসছি মুখে কড়া স্নো-পাউডার-সুর্মা-কাজল মেখে, উত্তেজক পোষাকে সেজে, গলির মোড়ে, পার্কের ধারে, আধো অন্ধকারে খদ্দের ধরার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে কিছু মেয়ে । বড়রা বলেছে ওরা বেশ্যা । ওরা ঘৃণ্য, পাপিষ্ঠ, তাড়িত । ওদের পল্লী নিষিদ্ধ --ভদ্রভাষায় 'রেড লাইট এরিয়া'। অতএব সাধারণ সমাজের মমতা সহানুভূতি ওদের কখনোই প্রাপ্য নয় ; ওদের সখ-আহ্লাদ, চাহিদা, অধিকার, দাবি -- কিছুই যেন নেই, থাকতে নেই ।

রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কোন ছাড়, ভারতের আইন 'বেশ্যাবৃত্তি'কে কোনোরকম অনুকম্পা বা সহানুভূতি দেয় নি । না দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে আইনশাস্ত্রে । বলা হয়েছে, এই প্রাচীন পেশা সাধারণ বিশ্ববাসীর কাছে অবাঞ্ছিত, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ৪ ও ৫ নং ধারার প্রত্যক্ষ বিরোধী , এবং ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কলঙ্কজনক । পতিতা-পেশার আইনী বাস্তবতা প্রসঙ্গে ১৯৯৭ সালে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এক রায়-এ বলেছেন,''পতিতাবৃত্তি এক মনুষ্যত্ব-বিরোধী অপরাধ, মানবাধিকারের প্রত্যক্ষ লঙ্ঘন, ভারতীয় আইনের চোখে সমাজ-দূষণকারী এক পেশা । সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে এই নিকৃষ্ট বৃত্তি বজায় থাকা অতি সংবেদনশীল একটি বিষয় -- সমাজ থেকে এই পেশা নির্মূল করার সদিচ্ছা সরকারের থাকা উচিত ।'' সরকার অদ্যাবধি কী পদক্ষেপ নিয়েছে ? রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত 'পিটা' আইন (Prevention of Immoral Traffic Act) লাগু করেছে । কাগজে-কলমে এই অ্যাক্টের উদ্দেশ্য হল বেশ্যাবৃত্তির মত অমানবিক ব্যবসাতে মেয়েদের ঢোকা বন্ধ করা, সমাজের 'শুচিতা' রক্ষা করা । অথচ বড় মজার এই আইনের বাস্তব প্রয়োগরীতি ঃ রস্তায় বা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে খরিদ্দার ধরার চেষ্টা করলে পুলিশ ধরবে, কিন্তু ঘরের ভেতর লুকিয়ে চুরিয়ে ভদ্রতার ভনিতা রেখে বেশ্যা-বৃত্তি চালালে সেটা 'পিটা' আইনের নাগালের বাইরে থাকবে । এই বকচ্ছপ মার্কা আইনী শাসনের বাস্তব চেহারাটা দাঁড়িয়েছে এই -- 'হতভাগ্য' দরিদ্র মেয়েদের গণিকাবৃত্তিতে চলে আসার মূল কারণকে দূর করা নিয়ে

মাথাব্যথা নেই পুলিশ প্রশাসন আইন-নিয়ামক বা রাজনৈতিক কর্তাদের । বরং দেহবিক্রির অবৈধ ব্যবসা চালু থাকলে কর্তাদের পোয়াবারো । পিটা প্রয়োগের নাম করে যখন তখন অরক্ষিত মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া, তোলা নেওয়া, যথেচ্ছ নারীদেহ ভোগ করা, অত্যাচার করা, তৎপর পুলিশী শাসনের পরিচিত চিত্র । অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানে যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের উপদেশ সরকারের প্রতি রয়েছে, কার্যক্ষেত্রে সেগুলি মোটা মোটা আইনি কেতাবের ভেতরেই ছাপার অক্ষরে বন্দী রয়ে গেছে ।

'বেশ্যা', 'পতিতা', 'গণিকা', 'খানকি' ইত্যাদি নামকরণের মধ্যেই সমাজের চূড়ান্ত ঘৃণা প্রকাশ পায় । এইসব অসহায় নারীরাও যে রক্তমাংসের মানুষ, তাদেরও যে মন আছে, চোখের জল আছে, সে বোধ সমাজে বিশেষ জায়গা পায়নি বহুকাল । পরিবর্তনের একটা বাতাস, বোধ করি, এ রাজ্যে আসতে শুরু করে সত্তর দশকের বৈপ্লবিক তুফানের অনুষঙ্গ হিসেবে । নতুন রাষ্ট্র নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নের জোয়ার সে সময় নিম্নবর্গের নিপীড়িত অবহেলিত মানুষকে মূলস্রোতের 'সভ্য ভদ্র' সমাজের অনেকটা কাছাকাছি এনেছিল । এবং সেই সময়, আশির দশকে, কাকতালীয়ভাবে বিশ্বজুড়ে এডস্ (AIDS) রোগের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল; রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নানা দেশি-বিদেশি প্রকল্প দ্রুত সক্রিয় হয়েছিল; শুরু হয়েছিল এডস্ সংক্রমণের অন্যতম উৎস বলে চিহ্নিত পতিতাপল্লীগুলির অন্দরমহলে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচী । এর ফলে অনিবার্যভাবে মনোযোগ পেয়েছিল এতকালের ''অচ্ছুৎ'' দেহপসারিণীরা ।

কালান্তক ব্যাধি এডস্-এর সঙ্গে এখন লড়াই-এ নেমেছে সারা বিশ্ব। আমাদের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গোড়াতে বিশেষ হেলদোল না থাকলেও 'জাতীয় এডস্-নিয়ন্ত্রণ পরিষদ'(NACO), 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'(WHO), DFID, UNAIDS, USAID, CIDA ইত্যাদি সংস্থার বিপুল অর্থ সাহায্য আসতে থাকে এডস্ প্রকল্পে, বিশ্বব্যাঙ্কের ছাড়পত্র নিয়ে । ১৯৯২ সালে দেশে এসেছিল ৩০ কোটি মার্কিন ডলার, ১৯৯৮ সালে ৩২ কোটি (১৪২৫ কোটি টাকা), পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় । এত টাকার ঢল, মৌমাছির মত উদ্যোগী সংস্থারা নামে-বেনামে এসে ভিড় করবে -- এতে আর আশ্চর্যের কী আছে ! রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এত বড় প্রকল্প রূপায়নের পরিকাঠামো নেই তাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের (NGO) সুযোগ দেওয়া হয় । প্রথমদিকে, ৯০-এর গোড়ায়, পশ্চিমবঙ্গে তিন-চারটি সংস্থা কাজ করছিল । ১৯৯৮ সালে ৮৮টি এন. জি. ও. সরকার মারফৎ অর্থসাহায্য পেয়েছে; বর্তমানে এ সংখ্যা শতাধিক । গণিকাদের সচেতন করে তোলা, সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, হাতের কাজ, পল্লীর পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, কন্ডোম ব্যবহারে উৎসাহ দান, 'নিষিদ্ধ পল্লী'র শিশুদের ও বড়দের প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা -- এরকম বহুবিধ 'প্রজেক্ট' নিয়ে ভালোরকম অর্থ সাহায্য জোগাড় করে এন. জি. ও.-রা । লক্ষ্য করার বিষয় হল, এত সব প্রকল্পের মধ্যে এডস্ রোগীদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয়, কিংবা পতিতাবৃত্তির মূল কারণ দূরীকরণ নিয়ে কোনো প্রকল্প নেই ।

এন. জি. ও.-দের টাকা নিয়ে নয়ছয়, হিসেবে কারচুপি, রিপোর্টে তথ্য বিকৃতি ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা যথেষ্ট শোনা যায় । তার সবটা না হলেও খানিকটা হয়তো সত্যি । অর্থের অবাধ যোগান এলেই তার হাত ধরে অনর্থ আসে । তাই কেচ্ছা কেলেঙ্কারিও হয় । সে অন্য গল্প । আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি ।

গত পনের-কুড়ি বছরে পতিতাদের সামনে রেখে উঠে এসেছে বহু এন. জি. ও. । বহু ডাক্তার, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী চাকরি পেয়েছে, **সরকারি-বেসরকারি কর্তাব্যক্তিদের ডলারের প্রসাদে হাত ভরেছে , এদেশ-ওদেশ উড়ে বেড়ানোর সহজ সুযোগ মিলেছে, কাগজে টিভি'তে ছবি উঠেছে, প্রচার পাওয়া গেছে । আর ওরা ? যাদের জন্যে এত প্রাপ্তি, সেই চিরলাঞ্ছিত পণ্য নারীরা কী পেয়েছে ?** ..... সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি সেই একই করুণ চিত্র; রাস্তায় ময়দানে পার্কে স্টেশনে মধ্য-নিম্নবিত্ত 'লাইনের' মেয়েদের ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি -- দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে । অন্যদিকে 'এডস্ প্রিভেনশন সোসাইটি' আর 'ন্যাকো'র পরিসংখ্যান বলছে ঃ পশ্চিমবঙ্গে এডস্ রোগের প্রাদুর্ভাব বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে । ১৯৮৬ সালে এ রাজ্যে প্রথম এডস্ রোগী ধরা পড়ে, তারপর থেকে আমাদের জনদরদী বাম জমানাতেই কালান্তক রোগটি বেড়ে চলেছে অবাধে । ২০০০ সালে পাওয়া গিয়েছিল ২২১ জন এডস্ রোগী, ২০০৩-এ সে সংখ্যা হল ৬১১, আর এ বছরের (২০০৫) ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চিহ্নিত রোগী ২৩৯৭ জন । এই রোগ বিস্তারও হয়েছে প্রধানত ওই 'পতিতা' নারীদের শরীরেই । দুঃখের ধারাপাতে মুক্তির পরিবর্তে এটাই হয়েছে ওদের পাওনা ।

তবু কিন্তু পেয়েছে ওরা অন্য এক ধন । বাইরের আবরণে বা অর্থের পরিমাপে নয়, পেয়েছে আপন চেতনার জগতে । গত দেড় দু' দশকের পতিতা-কেন্দ্রিক ছোট-বড় কর্মকান্ডগুলোর সুবাদেই ওরা অন্ধকার থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে; 'বেশ্যা' নামক ঘৃণিত পরিচয়ের জায়গায় 'যৌনকর্মী' নাম পেয়েছে, 'মানুষ' হিসেবে কিছু মর্যাদাবোধ খুঁজে পেয়েছে; নিজেদের সন্তানদের বাঁচার কথা, অধিকারে কথা, চাহিদার কথা বলার জোর সঞ্চিত করতে পেরেছে ওদের অনেকেই ।

প্রথম যে পরিবর্তনটা এলো ৮০-র মাঝামাঝি, সেটা হল আত্মনির্ভরতার প্রত্যয় । এতদিন এন. জি. ও.-র স্যার ভদ্রলোক দাদা-দিদিমণি'দের পেছন পেছন ঘুরে পল্লীর কর্মী মেয়েরা রোগ ছড়ানোর কারণগুলো জেনেছে, সাথীদের কন্ডোম ব্যবহারে সচেতন করেছে, পাড়ার ভেতরে স্বাস্থ্য-ক্লিনিক পাঠশালা চালাতে এন. জি. ও.'দের সাহায্য করেছে । তবু নিজেদের নিরাপত্তা পাচ্ছিল না তারা । দালাল-মাসী-মস্তান-পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে টক্কর দেওয়া যাচ্ছিল না । বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদে আরো বেশি মারধোর জুলুম হচ্ছিল । এরকম সময় এক কান্ড ঘটিয়ে ফেললো শেঠ গলির মেয়েরা । সাহসী কয়েকজন মেয়ে মিলে সেদিন শেঠ গলি'র কুখ্যাত 'ল্যাংড়া মস্তান'কে বেধড়ক ঠ্যাঙালো সবার সামনে । উল্টে প্রচুর মার খেলো বটে, রক্তারক্তিও হল , কিন্তু সেই প্রথম ওখানে মস্তানরাজ থমকালো । গলির মেয়েরা নতুন জোর পেল । গড়ে উঠলো যৌনকর্মীদের প্রথম একান্ত নিজস্ব সংগঠন 'মহিলা সংঘ', ১৯৮৭ সালে ।

মূক মুখে ভাষা, বাসনা, এবং দাবি-দাওয়া

'উৎস মানুষ' পত্রিকার মার্চ ১৯৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল মহিলা সংঘের সচিব আশা সাধুখাঁ'র খোলা চিঠি ঃ ''সাদা কথায় আমরা বেশ্যা । ভদ্রবাবুদের ভাষায় পতিতা । .... শুনছি (আমাদের নাম করে) কোটি কোটি টাকা আসছে দেশ-বিদেশ থেকে । টাকা মানেই ব্যবসা । তবে মা-বোনেরা এটা নিশ্চই মানবেন আপনাদের ভাঙিয়ে কেউ ব্যবসা চালালে সেটা আপনারও ভালো লাগবে না । ..... আমাদের সব গেছে, এখন একটাই স্বপ্ন -- আমাদের বাচ্চারা যাতে মানুষ হয়, তাদের যেন কোনদিন এ-পেশায় জড়িয়ে পড়তে না হয় ।''

এর মধ্যে মহিলা সংঘের ভেতর কিছু ভাঙাগড়া হল । তৈরি হল যৌনকর্মীদের 'মহিলা সমন্বয় কমিটি'। ১৯৯৬-এর এপ্রিলে সমন্বয় কমিটি কোলকাতায় তাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে । বিভিন্ন জেলার, অন্য রাজ্যের, এবং বিদেশেরও কিছু যৌনকর্মী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন 'ভদ্র' সমাজের 'মান্য' জনেরা । সেখানে কমিটির পক্ষ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ওঠে । প্রশ্ন তোলা হয় -- নারী নির্যাতনকারী 'পিটা' (Prevention of Immoral Traffic Act) আইন বাতিল করা হবেনা কেন ? এই অমানবিক পেশা সমাজ থেকে দূর করার লড়াইতে তথাকথিত ভদ্র সমাজ কি সামিল হবে ? ঘোষণা করা হয় -- ''আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা চাইছি যৌনকর্মী পরিচালিত একটি স্বশাসিত বোর্ড, যে বোর্ড মেয়েদের এ পেশায় ঢোকা, এবং যৌন ব্যবসার নিয়মনীতি ও যৌনকর্মীদের সার্বিক উন্নয়নের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে ।''

এর আগে ১৯৯১ সালের এপ্রিলে, আমরা চমকিত হয়েছিলাম নিম্ম বাই-এর খবর জেনে । ভারতের ইতিহাসে প্রথম সে ঘটনা । পেশায় 'বেশ্যা' নিম্ম বাই দিল্লীর চাঁদনী চক কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ১০ম লোকসভা নির্বাচনে । নির্বাচনী প্রচারে নিম্মর দলের দাবিগুলো ছিল -- পতিতাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ চাই, চাই বৃদ্ধ বয়সে বাসস্থান ও নিরাপত্তা, মাতৃ পরিচয়ে শিশুর পরিচয় বৈধ করা চাই । 'বেশ্যাবৃত্তি' টিকিয়ে রাখার দাবি সেদিনও উচ্চারিত হয় নি ।

হল ১৯৯৭-এর নভেম্বর মাসে, কোলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে । সোনাগাছি-কেন্দ্রিক যৌনকর্মীদের জোরদার সংগঠন 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' আয়োজন করেছিল সেই সাড়ম্বর ব্যয়বহুল ''যৌনকর্মীদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন''। দেশ-বিদেশের মোট ৩০০০ স্বঘোষিত যোনকর্মী, আমন্ত্রিত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, রাজনীতিক, সাংবাদিক, টিভি রেডিও ভিডিও টেলিক্যামেরা, আর ঝকমকে আধুনিকা স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের নিয়ে চোখ-ধাঁধানো বর্ণাঢ্য জমায়েত । গণিকাবৃত্তির অমানুষিক যৌনলাঞ্ছনা অপসারণের জন্যে নয়, বিকল্প সুস্থ পেশা বা সামাজিক পুনর্বাসনের রাস্তা খোঁজার জন্যেও নয়, এ সম্মলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেই অভিনব দাবিকে সামনে তুলে আনা -- ''যৌনকর্ম একটা 'কাজ', এ কাজের আইনী স্বীকৃতি চাই, যৌনকর্মীদেব শ্রমিকের অধিকার দিতে হবে ।''

এ কেমন ধারা দাবি ?

ধাক্কা সামলাতে সময় লাগে । পুরুষের ভোগ-লালসার প্রয়োজনে নারীর চরম অমর্যাদা যে পেশার চরিত্র, অসহায় রমণীর দেহকে টাকা দিয়ে সুলভে পণ্য হিসেবে কিনে নেওয়া যায় যে পেশায়, সেই পেশাকে নির্মূল করার লড়াই সংগঠিত না করে তাকে টিকিয়ে রাখা ? তাকেই একজন শ্রমিকের কাজের সমতুল্য করার আয়োজন ? কতখানি সমর্থনের যোগ্য এই দাবি ? বিভ্রান্তি আসে । আর, এই বিভ্রান্তি আসে বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগও আসে ।

ইদানীং দেখনদারি সুবিধাবাদী কালচারের বেশ বাড় বাড়ন্ত । বর্তমানের অনেক নামডাক-ওলা কবি শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকার বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান বেশ কুশলী, পাঁকাল মাছের মত । মানি, মিডিয়া, সম্বর্ধনা, উপঢৌকন দিয়ে এনাদের হাসি-হাসি মুখে মঞ্চে বসানো যায় । ফরমায়েস মাফিক বাহবা টাহবা দিয়ে কাজ সারেন এঁরা । তারপর সুরুৎ করে জনান্তিকে চলে যাওয়া, মুখে কুলুপ আঁটা । .... এই পরিস্থিতিতে 'দুর্বার'-এর পরিচালকরা পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু ''খ্যাতনামা''-র সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন । যেমন, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি (২০০৫) বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার প্রচুর আবেগ-মাখানো কথনে সহানুভূতি ঢেলে দিলেন উদার চিত্তে; কোনো সার্বিক ভালোমন্দ নিয়ে বিশ্লেষণ নেই, সমাজ-সংস্কৃতির সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে কোনো অভিমত নেই । বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক দায়িত্বের এই বহর দেখলে রীতিমত দুশ্চিন্তা হয় ।

তবে সবটাই এরকম জেগে ঘুমনোর চিত্র নয় । খোলা মনে সোজা কথাটা বলে দেওয়ার মত 'কণ্ঠ' এখনো শোনা যায়, এটাই ভরসা । ..... ১৯৯৭-এ 'জাতীয় যৌনকর্মী সম্মেলনে' সেই সাড়া জাগানো দাবিটি উত্থাপিত এবং মিডিয়া প্রচারিত হওয়ার পরই প্রখ্যাত সমাজকর্মী রামী ছাবরা ৮ জানুয়ারি ১৯৯৮ 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় লিখলেন -- ''একজন বারবণিতার পেশাকে সাধারণ ব্যবসার বৈধতা দেওয়ার অর্থ আইন ও মনুষ্যত্বের মর্যাদার লঙ্ঘন । অন্ধকার জগতের পেশায় লিপ্ত থাকলেও একজন পতিতার নাগরিক হিসেবে মানবিক অধিকার থাকে । তাহলে, মানব-অবনমন আর মানবাধিকার কি একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলবে ? কেন এই বিষয়টি জনসাধারণের কেছে বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত হবে না ! 'পাপ'কে প্রতিহত করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় কি ?'' ১ এপ্রিল ২০০১ আনন্দবাজারে বাণী বসু লিখলেন - ''এঁদের দাবির সপক্ষে বলা হচ্ছে বারবধূরা নাকি একটা পরিষেবা দিচ্ছেন । কিছু অস্বাভাবিক পুরুষ নিজস্বার্থে এঁদের যৌনদাসী করে রেখেছে, এরই নাম পরিষেবা? কী ভয়ঙ্কর কথা ! ..... মান্যগণ্যরা দেখলাম মঞ্চে বসে বললেন, কাজটি নাকি নৈতিক । এঁদের পেশাটি নৈতিক হলে পুরুষের অনাচারটিও নৈতিক হয় । নারীমাংস ব্যবসাটিও অনৈতিক থাকছে না আর । এই মান্যগণ্যরা মধ্যযুগের নারীমাংস-হাটে ফিরে যেতে চাইছেন । মানুষ মানুষকে পণ্য করছে, এটা মনুষ্যত্বের অপমান নয় ?''

গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ৭নং রাউডন স্ট্রীটে একটি ঘরোয়া সভা হয়, যৌনকর্মীদের দাবি নিয়ে বিতর্কসভা । সেখানে তসলিমা নাসরিন 'দুর্বার'-এর কর্তাব্যক্তি ও নেত্রীদের সরাসরি বলেন -- **পতিতাবৃত্তিকে যৌনকর্ম বলুন আর 'কাজ'ই বলুন, এ তো পুরুষতন্ত্রের কদর্য প্রতীক । পুরুষের আরাম আয়েশ আহ্লাদ মেটানোর জন্য, পুরুষের ধর্ষকামের শিকার হওয়ার জন্য নারীকে নিয়োজিত করা । বেশ্যা নিয়ে পুরুষতন্ত্রের ফূর্তিতে জীবন কাটানোর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার দাবি কেন করবেন আপনারা ?** আদিম অত্যাচারের অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই না করে টাকার বিনিময়ে এই পুরুষতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখায় সামিল কেন হবেন ? দাবিদার 'দুর্বার'-এর কাছে এসব কথা পছন্দসই লাগেনি বোঝা গেছিল । তাঁদের তিনজন মুখপাত্র এসেছিলেন সভায় । নিজেদের দাবি জোর গলায় পুনরাবৃত্তি করে চলে যান তাঁরা, কোনো বিতর্কের সুযোগ না দিয়েই ।

মুশকিল হল যৌনকর্মীদের ব্যক্তিগত মনের খবর প্রকাশ হয় না । বিভিন্ন সম্মেলন, সভা, সেমিনার, গণমাধ্যমে দুর্বার-এর প্রখর কর্মীবক্তারা, অদ্ভুতভাবে ছকে বাঁধা কথা সর্বদা সর্বত্র একই সুরে বলে যান -- ''আমরা পরিষেবা দিচ্ছি । এটা একটা 'কাজ'। সমাজে বহু সাংসারিক অসুস্থতা কাটাতে সাহায্য করি আমরা । যৌনকর্ম হল প্রকৃত কর্ম । আমরা কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করি । আমরা শ্রমিকের বৈধ অধিকার দাবি করি ।'' ব্যাস্ । কোনো সরাসরি

বিতর্কে যেতে তাঁদের খুব অনীহা । এনাদের কথাগুলো বারবার শুনলে যে-কারুর মনে হবে যেন পখীপড়া বুলি, হোমওয়ার্ক করা, যেন পেছন থেকে এঁদের মুখে কথাগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

... আর ওঁরা ? ওই যে দূরে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অপুষ্ট ক্লিষ্ট মামুলি সাধারণ যৌনকর্মীরা, বিলকিশ গায়েত্রী পাতনি রেখা আয়েশা মালা, যাঁদের মুখ থেকে সহজে কথা বেরোয় না, যাঁরা মিছিলের শেষ দিক ভরাট করেন সবসময়, ওঁরা কী বলেন ? শোনা যায় না ।

মনের আসল ইচ্ছে আসল দাবি তো জানা যায় কাজে, কথায় নয় । একটু চেনা পরিচয় হলেই বোঝা যায়, 'লাইনে'র মেয়েদের সবারই মনের কথা হল -- **আমাদের সন্তানরা যেন কোনোদিন-ই এ লাইনে না আসে;** তারা যেন লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের সমাজে মিশে যেতে পারে । বছর খানেক আগে শেঠ গলির গীতা কাগজে খবর হয়েছিল, ছবিসহ । দুর্বার-এর এই সক্রিয় সদস্যা এডস্ আক্রান্ত হয়েছে, দুর্বার কমিটি তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিল, প্রচার-মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল । সুশ্রী চেহারার সেই যৌনকর্মী গীতা আজ এডস্ এর মরণ-কামড়ে কঙ্কালসার । এ-হাসপাতাল ও-হাসপাতাল ঘুরে এখন স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন-এ ধুঁকছে । দুর্বার তাকে ত্যাগ করে যায়নি অবশ্যই, কিন্তু গীতা তার অতীতকে ত্যাগ করতে চায় । তার শেষ জীবনের একমাত্র চিন্তা -- মেয়ে পূর্ণিমা । সে যাতে কোনো আশ্রম বা হোমে বড় হয়ে উঠতে পারে, যেন কোনোদিন তার মায়ের পাড়ায় পা না রাখে । গীতা আজ ভুলেও দাবি করে না এই কদর্য পেশা টিকে থাকুক ।

কেবলমাত্র গীতা নয়, শান্তিপুর ছোটবাজারের শিখা বসাক, শেওড়াফুলির রিঙ্কি ভগৎ, রমা দাস, শেঠ গলির শান্তি, কালীঘাটের আসমা বিবি -- এরকম শ'য়ে শ'য়ে যৌনকর্মী মা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁদের সন্তানদের এ পেশা থেকে দূরে রাখতে । তাঁরা যেভাবেই হোক বাচ্চাদের কোনো ভালো হোম বা আশ্রম বা কোনো দরদী সংস্থার আশ্রয়ে রাখতে চাইছেন খরচ খরচা দিয়ে, যেখানে লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ওরা ভদ্রসমাজে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে । যৌনকর্মে নিজের মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য পেশা-স্বীকৃতির দাবি এঁদের কারুর নয় । আমাদের খেয়াল পড়বে, দুর্বার-এর আগে আর কোনো যৌনকর্মী সংগঠন বা কোনো আগুয়ান যৌনকর্মী এরকম দাবি করেনি ।

তাহলে এ কাদের দাবি ?

সেটাই গূঢ় প্রশ্ন। কাদের দাবি ? যাদের বুদ্ধি পরামর্শ পরিকল্পনা আর সাহায্য নিয়ে 'দুর্বার' এই দাবিটাকে তাদের ফেস্টুনে তুলে নিয়েছে, সেই নেপথ্যচারী এন. জি. ও.-র চৌকষ 'ভদ্র' ঘরের পরিচালক, নেত্রী ও সংস্থাকর্মীরা (যাঁরা যৌনকর্মী নন), তাঁরা কি এ দাবির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সামিল হবেন ? যদি কখনো যৌনপেশা এ রাজ্যে আইনি স্বীকৃতি পায়, 'যৌনকর্মী নিয়োগ কমিশন' তৈরি হয়, তখন কি ওই এন. জি. ও. কর্তা কর্মীরা তঁদের ঘরের মেয়েদের সে 'কাজ' নিতে পাঠাবেন ?

জানা কথা পাঠাবেন না । বেশ্যার কাজ কেউ সাধ করে নেয় নাকি ? বরং এখন যেমন করছেন তাঁরা, 'ভদ্র' সমাজে থেকে, 'ভদ্র' স্কুল-কলেজে পড়ে 'ভদ্র' কেরিয়ার করা, 'ভদ্র' সংসার গড়া, সেরকমই করবেন । তবু কিন্তু ওনারা যৌনকর্মীদের পেশা-স্বীকৃতির দাবি আদায়ের আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন । হিসেবের গরমিলটা এখানেই । কেমন যেন অভিসন্ধির গন্ধ পাওয়া যায় ।

তাই, অমানবিকতা অমর্যাদা ঘৃণা লাঞ্ছনার থেকে মুক্তির স্বপ্ন যদি দেখতেই হয় তবে এই নিকৃষ্ট যৌনপেশার বিকল্প কোনো সুস্থ নিরাপদ কাজের দাবি কেন নয় ? কেন গ্রাম-মফঃস্বলের দারিদ্র্য-তাড়িত যৌনকর্মী মেয়েদের স্থানীয়ভাবে অর্থ-সংস্থান প্রকল্পের দাবি উঠবে না ? এ দাবি সহজে পূরণ হবার নয় ঠিকই, কিন্তু কোন সামাজিক অর্থনৈতিক লড়াইটা সহজে জেতা যায় ? লড়াই চালিয়ে তো যেতেই হয় । 'পিটা' বাতিল করে 'যৌনব্যবসার বৈধতা কায়েম করা'টাও কি সহজ হবে ? ১৯৯৭-এ সল্টলেক স্টেডিয়ামের সেই প্রথম জাতীয় সম্মেলনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত স্বয়ং উপস্থিত থেকে যৌনপেশার মেয়েদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেসব আজ কোথায় ? ইন্দ্রজিৎবাবু প্রয়াত হয়েছেন । আমাদের দেশে বা রাজ্যে প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য বোধহয় দেওয়া হয় না ।

অর্থ আর রাজনীতির খেলা আমরা বারবার নানা রূপে দেখি । সে খেলায় দাবার ঘুঁটি হবে কেন 'দুর্বার'? হাজারো বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা মেয়েদের নিয়ে দুর্বার লড়াই যদি চালাতেই হয় তবে তা নারীর স্থায়ী যৌনদাসী হয়ে থাকার বিরুদ্ধে চালিত হোক । তাদের ভাঙিয়ে খাওয়ার কৌশলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ যৌনকর্মীদের প্রকৃত দুর্বার হয়ে ওঠা এখন সবচেয়ে জরুরী ।

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি আয়োজিত যৌনকর্মীদের
প্রথম জাতীয় সম্মেলন-এ যৌনকর্মীদের জবানবন্দী

এ-লড়াই আমাদের জিততেই হবে

সমাজ যেন আজ এক নতুন ভূত দেখছে, অথবা যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে ঠেলে রাখা ছায়ারা আজ মানুষের রূপ নিচ্ছে বলেই এত ভয় । গত কয়েক বছরের যৌনকর্মীদের আন্দোলন আমাদের সমাজ-জীবন-যৌনতা- -ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে বহু প্রশ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে । আমরা মনে করি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা এবং নতুন নতুন প্রশ্ন তোলা আমাদের আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

যৌনকর্মীদের আন্দোলন কী নিয়ে

১৯৯২ সালে এইচ. আই. ভি./এইডস্ সংক্রমণ প্রতিরোধ-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যের কাজকে ঘিরে সোনাগাছি অঞ্চলে যৌনকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের, এক সঙ্গে কাজ করার, ভাববার একটা জায়গা তৈরি এবং চালু করতে গিয়ে আমরা পরিষ্কারভাবে টের পাই যে, অনেক বড় সামাজিক ব্যাধি দূর না করালে এই কর্মসূচি পালন করা অসম্ভব । যেমন, কোনো যৌনকর্মী তার খদ্দেরকে কন্ডোম ব্যবহার করতে রাজি করাতে পারবে কিনা - এই আপাত সরল প্রশ্নের উত্তরও আসলে বেশ জটিল । অনেকভাবে এই বিষয়টি দেখা যেতে পারে । সংক্রমণ কীভাবে হয়, কীভাবে কন্ডোম তা আটকাতে পারে, সংক্রমণের ফল কী -- এই সহজ তথ্যগুলোও বোঝা এবং সেই অনযায়ী চলার মতো মনের জোর, শিক্ষা, একটি যৌনকর্মী মেয়ের আছে কি ? ক্রমাগত তথাকথিত 'পাপ ব্যবসায়' থাকার গ্লানি নিয়ে যে বেঁচে থাকে, তার জীবনের দাম নিজের কাছেই কতটুকু ? পেশার চৌহদ্দিতে বদল ঘটানোর সামান্য ক্ষমতাটুকুও যে তার রয়েছে -- সেই বিশ্বাসই সে হারিয়ে ফেলেছে ; তা ছাড়া বাস্তব ঘটনা হল, পেট ভরানোর তাগিদে তাকে বহুক্ষেত্রেই কাস্টমারের দাবি মেনেই কন্ডোম ছাড়াই সংগম করতে হবে ।

আবার যে-খদ্দের তার কাছে আসছে, সে কোনো মেয়ের কাছ থেকে, বিশেষত 'অশিক্ষিত' নষ্ট গরিব মেয়েমানুষের কাছ থেকে কোনও কিছু শিখতে রাজি হবে কি ? তার কাছে যৌনপল্লীতে আসাটাই কি অসংযম/ অসাবধানতার কাজ নয় ? সেক্ষেত্রে এই সম্পর্কের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সাবধানতা ইত্যাদি তার মানসিকতার উল্টোমুখী নয় কি ? কন্ডোম পুরো ফূর্তির পথে এক অনাবশ্যক বাধা মাত্র ।

অন্যদিকে এই খদ্দের পুরুষটি, নিজেই যে অনেক ক্ষেত্রে গরিব, ছিন্নমূল মানুষ -- নিজের জীবনের মূল্য, স্বাস্থ্য, সাবধানতা ইত্যাদি সম্পর্কে তারই বা বোধ কতদূর ? একই সঙ্গে, যে যৌনকর্মী খদ্দেরের সঙ্গে কন্ডোম ব্যবহারে আগ্রহী, সে-ই আবার প্রেমিক বা স্বামীর সঙ্গে কন্ডোম ব্যবহার করেন না কেন ? ব্যবসা আর ভালবাসা, সাবধানতা আর বিশ্বাসের কোন্ হিসেবগুলো এখানে কাজ করে ? প্রেম, সংসার, মা হওয়া থেকে শুরু করে নানান সামাজিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক এবং সম্পর্কের চালচিত্র ।

এইরকমভাবে একটা সরল প্রশ্নের আলোচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, বিষয়টা আসলে একেবারেই সরল নয় । যৌনতা এবং যৌনকর্মীদের জীবন-আন্দোলন আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত । আরও কত পেশার মত যৌন-পরিষেবা আর একটা পেশা । সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটা চাহিদা মেটায় বলেই এই পেশায় নিযুক্ত

লক্ষ লক্ষ মেয়েদের এবং পুরুষদের শ্রমের কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই । বরং উল্টে আছে অপমান আর অবমাননা । শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকার আমাদের দেওয়া হয় না ,বরং রাষ্ট্র ও তার পুলিশবাহিনী, রাজনৈতিক গুন্ডা , নানা দালাল, নানা বাহানায় আমাদের ওপর অত্যাচার চালায় ।

একজন যৌনকর্মীর ওপর যে-অত্যাচার চালানো যায়, একজন সাধারণ শ্রমিকের ওপর সে অত্যাচার চালানো যায় না । কারণ 'পাপ ব্যবসা' বলে নীতির দোহাই দিয়ে যৌনকর্মীদের অন্ধকারে গলা টিপে রেখে দেওয়া যায় । সমাজের আর পাঁচটা পেশার মত ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ এখানে নেই । যদিও বাস্তবে কোনো একজনও যৌনকর্মীর সামাজিক পুনর্বাসন সম্ভব নয় , তার কারণ সমাজের অস্বীকৃতি । যৌনপেশায় একবার ঢুকলে সমাজ তার গায়ে যে 'ছাপ' লাগিয়ে দেয়, তা কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না, এ সমাজ তা ভুলতে দেয় না । তাছাড়া যে-সমাজে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার সেখানে ওই পেশায় নিযুক্ত হাজার হাজার মেয়েদের আর্থিক পুনর্বাসন আদৌ কি সম্ভব ? অন্যদিকে আমাদের নিয়ে যারা ভাবেন এবং কেউ কেউ হয়তো খুবই সহানুভূতি নিয়েই এগিয়ে আসেন, তারাও অধিকাংশ সময় এই পেশা বন্ধ করার দাবি বা আমাদের পুনর্বাসনের বাইরে বেশি দূর ভাবতে পারেন না ।

যৌন-নীতির ইতিহাসটা কী ?

মানুষের জীবনে আর-পাঁচটা প্রবৃত্তির মত যৌনতার একটা স্বাভাবিক ভূমিকা আছে, প্রয়োজন আছে । মানুষ তথা সমাজের বিকাশের পথ ধরেই জীবন-জীবিকায় যৌনতা এবং এ-সম্পর্কিত সমস্ত ধারণা, অভিব্যক্তি ও বোধের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে যুগ যুগ ধরে । সমাজ, পরিবার ইত্যাদি গঠনের সঙ্গে যৌনতা ও যৌনতার ধারণা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত । কারণ এই উৎপাদন-ব্যবস্থা তথা উৎপাদন প্রক্রিয়া একদিকে পুরুষতান্ত্রিক অন্যদিকে নারী-বিদ্বেষী । তাই মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তির মতো যৌনতাকেও আমাদের সামাজিক ও মানসিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না ।

আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো কেবলমাত্র আমাদের যৌনতার এক আংশিক ও সংকীর্ণ রূপকেই স্বীকার করে । যৌনতার একটা প্রধান দিক আদরের, সুখের, অনুভবের, কামনা-বাসনার । একদিকে আমাদের শিল্পে সাহিত্যে আমরা এই নিয়ে আখ্যান বানাই , আবার অন্যদিকে আমাদের প্রচলিত বিধানে যৌনতার একমাত্র নৈতিক ও আইন-স্বীকৃত এলাকা হল পরিবারভুক্ত বিবাহিত জীবনে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক । অর্থাৎ, যৌনতার নানা অভিব্যক্তি ও অভিজ্ঞতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, আমরা তাকে নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আটকেছি । কিন্তু কেন ?

পুরুষ ও নারীর যৌনমিলনের মধ্যে দিয়ে শিশুর জন্ম হয় । আমাদের ইতিহাসে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে টিকিয়ে রাখার জন্য 'বংশ' তৈরি করার প্রয়োজন হয় । ভেবে দেখলে বোঝা যায়, যে-নীতি নিয়ে আমাদের এত মাতামাতি, তা আসলে যুগ যুগ ধরে কোনো বিশেষ 'বংশের' সম্পত্তি ও ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য তৈরি করা । বলা বাহুল্য, আমাদের বহু যুগের ইতিহাস যেহেতু পুরুষদের প্রাধান্যের ইতিহাস, এই 'বংশের' ধারক ও বাহক পুরুষরাই । আমাদের ভাষায়ও আমরা তাই বলি -- বহু 'পুরুষ' ধরে মেয়েরা এখানে কেবলমাত্র জন্ম-দেওয়ার যন্ত্র । এইভাবে যৌনতা থেকে কামনা-বাসনা, আদর, সুখের অংশগুলোকে বাদ দিয়ে সমাজ সম্মানের আসনে বসালো কেবলমাত্র জন্ম দেওয়ার, 'বংশরক্ষার' কাজটিকেই, যেহেতু এই জন্ম কেবল নারী-পুরুষ মিলনেই হওয়া সম্ভব । মেয়েদের মধ্যে বা পুরুষদের মধ্যে সমকামী যৌন সম্পর্ক কেবল অস্বীকৃতই নয়, অবাঞ্ছিত, অস্বাভাবিক, অসুস্থ বলে চিহ্নিত হল । অর্থাৎ জননের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য যৌন মিলনের কোনো স্বীকৃতি রইল না ।

আমরা কি তাহলে মাতৃত্বকে অস্বীকার করি ? যেহেতু আমরা এমন এক পেশায় আছি যেখানে বৈধ মাতৃত্বের কোন জায়গা নেই, আমরা কি গায়ের ঝাল মেটাতে সব মাতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছি ? তা নয় । কোন মেয়ে যদি মা হতে চায় তাহলে তার অবশ্যই সেই চাহিদা পূরণ করার অধিকার আছে । কিন্তু মাতৃত্বকে নারীত্বের চরম বা পরম পরিপূর্ণতা বলে প্রচার আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের সামাজিক এবং যৌন স্বাধীনতাকে দমন করার একটা কৌশল । পরিবারের মধ্যে মাতৃত্বর লক্ষ্যেই যেন তার যৌনতার একমাত্র প্রকাশ ঘটতে বাধ্য । অন্যদিকে, আমরা

যৌনকর্মীরাও অনেকেই মা । সেই সন্তানরা আমাদের খুব প্রিয় । সমাজের ভাষায় তাদের অনেকেরই 'বাপের ঠিক নেই', কিন্তু এর মধ্যেও এই মাতৃত্ব 'বংশ' রক্ষার সংকীর্ণ দাবী, নির্মম দায়ের থেকে কিছুটা মুক্তি দেয় । এই মাতৃত্ব খানিকটা মেয়েদের নিজের । যদিও বৃহত্তর সমাজের নারীত্ব ও মাতৃত্বের ধারণা থেকে আমরা কখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারি না । পরিবার, সংসারের অসম্ভবতা আর বাসনা বহু যৌনকর্মী মেয়ের জীবনে চিরস্থায়ী যন্ত্রণার উৎস ।

যৌনতায় কি মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার ?

সমাজ যদি সত্যিই যৌনতাকে গোপন, পবিত্র, জন্মদানকেন্দ্রিক কাজ বলেই মনে করে তা হলে এই সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপরেই সমানভাবে প্রয়োগ হওয়া উচিত; কিন্তু তা হয় না । যে জন্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এত কান্ড, তা মূলত যেমন পুরুষ সন্তানের, তেমনি যৌনতার অধিকারও পুরোপুরি পুরুষের হাতে । ধর্মভেদে কিছু আচার বিচারে সংস্কার ঘটলেও বহু বিবাহের বা একাধিক নারী সংসর্গের বহুগামিতার সামাজিক শাস্ত্রীয় বিধানের বাইরে যে সামাজিক জীবনে আমরা বাস করি তার প্রচলিত বাধা- নিষেধগুলোই বা কী ধরনের ? একটি মেয়ে কিশোরী হতে না হতেই তার চালচলন নিয়ন্ত্রিত হয় -- নইলে পুরুষের খারাপ নজরে পড়বে । বিশ্ববিদ্যালয়ের দিদিমণি সালোয়ার কামিজ পরে ক্লাস নিতে পারেন না । আবার এই নির্লজ্জ পুরুষতান্ত্রিক অত্যাচারকে 'ঐতিহ্য' 'শালীনতার' নামে স্বীকৃতি দাওয়া হয় । মেয়ে দেখার নাম করে পাত্রের পুরুষ অভিভাবকরা মেয়েদের শরীর খুঁটিয়ে দেখেন -- যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম (আবার সেই বংশ) সুলক্ষণযুক্ত ও গৌরবর্ণ হয় । একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ যৌন পত্রিকায় মেয়েদের ছবি পুরুষদের দর্শকাম মেটায় । ছেলেদের দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম থেকে বাথরুমের ফিটিংস্ পর্যন্ত নানা বিজ্ঞাপনে সুন্দরীরা পুরুষের মন ভরায় ।

বলা বাহুল্য, এই সামাজিক পরিবেশে, সাংস্কৃতিক ব্যবসায়, মেয়েদের নিজস্ব যৌনতার কোনো জায়গাই প্রায় নেই । তাদের শরীর ঢাকতে হয় পুরুষের ভয়ে । আবার শরীর খুলে দেখাতেও হয় পুরুষের মনোরঞ্জনে । আজকাল বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসের ক্রেতা হিসেবে মেয়েদের দেখা যাচ্ছে । একদিকে কিছুটা স্বাধীনতার আভাস মিললেও এই ভূমিকা অনেক অংশেই পুরুষ-নির্দিষ্ট এবং পণ্য ও ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর, যেখানে মেয়েদের পূর্ণ হয়ে ওঠা, আকর্ষণীয় হওয়া, সবই নির্ভর করে তাদের পয়সার জোরের ওপর ।

আমাদের আন্দোলন কি পুরুষ-বিরোধী ?

আমাদের আন্দোলন অবশ্যই পুরুষতন্ত্র বিরোধী , কিন্তু ব্যক্তিপুরুষ বিরোধী নয় । যৌন ব্যবসায় কিছু ঘরের মালিকানা মেয়েদের হাতে থাকলেও যে আড়কাঠিরা ধরে আনে, যে দালালরা খদ্দের যোগায়, যে মস্তান, পুলিশ এবং শোষণযন্ত্র এই ব্যবসার ওপর পরগাছার মত বেঁচে থাকে, তারা সবাই পুরুষ । তার চেয়েও বড় কথা তাদের নারী এবং যৌনপেশা সম্পর্কে ধারণা কঠোরভাবে পুরুষতান্ত্রিক । তারা নারীদের সাধারণভাবে অক্ষম/পরনির্ভরশীল/ চরিত্রহীনা/অযোগ্যা/অবিবেচক ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করে এবং এই সর্বগ্রাসী মূল্যবোধের শক্ত বঁধনে বাঁধাপড়া সাধারণ মানুষ (স্ত্রী, পুরুষ উভয়ে) যৌনকর্মীদের শোষণ ও নিপীড়নকে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণী প্রক্রিয়া বলে মনে করে । ক্ষমতার মজা এমনই যে, দীর্ঘ প্রভাবে এই মতাদর্শ 'সর্বজনীন' রূপ নিয়েছে । আমরা যৌনকর্মীরাও নিজেদের পুরুষদের চোখে 'বেহায়া, নষ্ট' হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হই । পুরুষরা যারা আমাদের কাছে আসে তারাও এই অবদমনের শিকার হয় । কখনও এই পাপবোধ 'নিষিদ্ধ' কাজের উত্তেজনা বাড়ায়, কখনও বিকৃতির জন্ম দেয়, আবার কখনও আত্মগ্লানির সৃষ্টি করে । কিন্তু প্রায় কখনই স্বাভাবিক সংযোগের, মিলনের, আত্মবিশ্বাস বা মর্যাদা দেয় না ।

'পুরুষ' বলে এক কথায় সবাইকে বর্ণনা করা যায় না । পুরুষ মানে অনেক রকমের মানুষ -- তারা সামাজিকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত রয়েছে, তাদের সবার পক্ষে সমাজ এবং পরিবার-নিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণবিধি মেনে চলা শুধু অসম্ভব নয়, বহুক্ষেত্রে অবাস্তবও বটে । যে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য পরিবারের জন্ম, সেই প্রক্রিয়াই আবার প্রথম যৌবনে যে পুরুষ অন্য নারীর সংসর্গ চায়, যে শ্রমিক শহরে উদ্বাস্তু, ঘর-পরিজন থেকে বহু দূরে, পরিবার পরিত্যক্ত, যে যুবকের পরিবারের গন্ডিতে ঢোকার সামর্থ্য নেই, তাদের কামনা-বাসনা এবং উষ্ণতা খোঁজার

স্বাভাবিক তাড়নাকে বিকৃত অসামাজিক এবং অপরাধী হিসাবে পরিবারের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে । পরিবারকে তৈরী করে নারী অবদমনের কাঠামো হিসাবে । নারী চরিত্র নিয়ন্ত্রণের নাম নিষ্পেষণ এবং বহুক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই যে স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্ক হিসাবে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল তাকে কলুষিত ও বিধ্বস্ত করাকে সমর্থন করা যায় না । বরং মানুষের স্বভাবের প্রয়োজনের এবং মানসিক বাসনা-কামনার দিকটিকে অবহেলা তথা অস্বীকার করা কোনো সুস্থতার লক্ষণ নয় । আমাদের সমাজে এইসব প্রয়োজনের কোনও সহজ স্বীকৃতি নেই । অথচ এই অস্বীকৃতি এক অসুস্থ পরিবেশ তৈরি করেছে -- যার ভার নারী-পুরুষ সবাইকে বইতে হলেও, বেশি আঘাত এসে পড়ে মেয়েদের উপর ।

যে কোনো কলকারখানা, ট্রাক আড্ডা, গঞ্জের পাশে সব যুগেই তৈরি হয় বা হয়েছে বেশ্যাপাড়া । যে মুনাফার ব্যবসা পুরুষ শ্রমিককে ছিন্নমূল করে, সেই ব্যবস্থাই মেয়েদের যৌনশ্রমিক করে তুলে আনে সেই পুরুষের প্রয়োজন মেটাতে ।

দুঃখের বিষয় এই যে, পুরুষতন্ত্রের শেকড় আমাদের মনের এতই গভীরে এবং এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে পুরুষদের স্বার্থরক্ষা করে বলে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলনে মেয়েদের প্রশ্নই তেমনভাবে কখনও জায়গা পায়না, যৌনকর্মীদের প্রশ্ন তো দূরস্থান । যে-পুরুষ শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে দাবি দাওয়া নিয়ে লড়ে, মেয়েদের ব্যাপারে সে-ও কিন্তু বারবার পুরুষতন্ত্রের, পরিবারতন্ত্রের পতাকা ধরে, শোষকের ভূমিকাই নেয় ।

আমরা কি পরিবারের বিরুদ্ধে ?

সমাজের চোখে আমরা, যৌনকর্মী মেয়েরা বা আরো বড়ভাবে বিবাহিত জীবনের বাইরে সব মেয়েরাই, যেন পরিবারের প্রধান শত্রু। আমাদের প্রলোভনে পুরুষ বিপথগামী হয়, সংসার ভাঙে -- এ তত্ত্ব বহুযুগ ধরে ধর্মযাজকেরা, সমাজপতিরা প্রচার করেছেন । সেই ছোট্টবেলার থেকে পরিবারের গন্ডিতে, লোকপ্রথায়, প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, তথা আমাদের প্রতিটি ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় এই ধারণা বা বিশ্বাসকে মনের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া হয়, তৈরি করা হয় নারী বিদ্বেষ, যে বিশ্বাসের শিকার নারী এবং পুরুষ উভয়েই । আমরা আবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের এ আন্দোলন পরিবারের বিরুদ্ধে নয় । বরং আমরা পরিবারের ধারণা, তার চলতি চেহারার মধ্যে যে অসামান্য পীড়ন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও অপব্যবহার চলছে -- তাই নিয়েই প্রশ্ন তুলতে চাই । সেই অর্থে এই আন্দোলন এক উন্নত এবং সত্যিকারের মানবিক পরিবার গড়ে তোলার সপক্ষে এক জোরদার প্রয়াস -- যৌনকর্মীদের আন্দোলন সামগ্রিকভাবে সেই নারী-বাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে । যৌনকর্মীরাও আজ সাথী হতে চায়, সামর্থ্য যোগাতে চায় বৃহত্তর আন্দোলনে । চরম-সত্যি কথা বলতে কি আজ যেসব মেয়েরা যৌন পেশায় যুক্ত, তাদেরকে পেশা বেছে নিতে হয়েছে মূলত পারিবারিক অত্যাচার ও পীড়নের শিকার হয়ে ।

আর পাঁচটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত পরিবার ও রাষ্ট্র সমাজের সঙ্গে যুক্ত ; এর মূল ভিত্তি হল বংশ, রক্ত এবং যৌন আনুগত্য । ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের কাঠামোতে বহু পরিবর্তন ঘটেছে । একান্নবর্তী পরিবারের জায়গায় এসেছে এক-দম্পতি ভিত্তিক অণু-পরিবার । এর পেছনে কারণ অনেক -- যৌথচাষের কাজ ছেড়ে ব্যক্তিভিত্তিক চাকরী, গ্রাম থেকে শহরে আসা ইত্যাদি ।

যদি দুজন মানুষ পরস্পরকে ভালবেসে একসঙ্গে থাকতে চায়, সন্তানদের সমানভাবে মানুষ করতে চায়, সমাজের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে চায়, তার চেয়ে ভাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর কি-ই বা হতে পারে । কিন্তু বাস্তব কি তাই ? আমাদের চারপাশে বহু পরিবারে কোনো ভালবাসা নেই, অত্যাচার আছে, ভাত কাপড়ের বিনিময়ে স্ত্রী সেখানে যৌন-কর্মী মাত্র । অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষমতা নেই, সুযোগ নেই এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে অন্য জীবন বেছে নেওয়ার । আবার কিছু ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জানাবোঝা সত্ত্বেও সমাজিক চাপে বিয়ে এবং পরিবার টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় । এই অবস্থা কি কাম্য ? স্বাস্থ্যকর ?

নারী নিয়ন্ত্রণের সহজ রাস্তা -- সতী অসতীর ছাপ্পা

এই যে চেপে বসা পরিবারতন্ত্র, অসম দাম্পত্য সম্পর্ক, তার প্রধান শত্রু হিসেবেও দেখান হয় মেয়েদের যৌনতাকেই । ভাগ করে দিয়ে শাসন করার এই নিয়মে তৈরি হয় স্ত্রী বনাম পতিতার বিভাজন অথবা সতী বনাম অসতীর গল্প ।

সতীসাধ্বী স্ত্রীর কোনো যৌনতা থাকে না -- শুধু মা হওয়া আর সংসারের কাজ । তার ঠিক উল্টো প্রান্তে থাকে 'নষ্ট' মেয়েমানুষ, যে আবার নিছক একটি যৌনতন্ত্র -- মাতৃত্ব, সংসারের কাজ তার জন্য নয় । এর মাঝখানে মেয়েদের ভালোমন্দের বিচার চলে তাদের যৌনতা লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা বা চেষ্টার ওপর ভিত্তি করে । পাড়ার মেয়ে বেশি সাজলে খারাপ, মডেল কিংবা চলচ্চিত্রের নায়িকা অনেকটাই নষ্ট ইত্যাদি । এই পুরো ব্যাপারটাই মেয়েদের যৌনতার সঙ্গী তৈরি করে পুরুষরা মেয়েদের যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় । তাদের সুবিধা মেটাতে, তাদের তৈরি করা সমাজের কাঠামো অটুট রাখতে । এক দিকে সংসার-পরিবার বাঁচাতে তার স্ত্রী আছে, অন্য দিকে তার যৌনকামনা মেটাতে আছে যৌনকর্মীরা, মেয়েদের যৌনতার স্বাধীন স্বীকৃতি কোথাও নেই ।

আমাদের যৌনকর্মীদের মতো এত বেশি করে আর বোধহয় কেউ জানে না, কী গভীর নিঃসঙ্গতা, কী যন্ত্রণা ও আর্তির থেকে কী প্রবল কামনা পুরুষকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে । যৌনক্রিয়া একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাৎক্ষণিক উত্তেজনার উপশম করলেও যৌন অনুভূতি ও আনন্দের পূর্ণতা দেয় না । শারীরিক সঙ্গমের বাইরেও স্পর্শের অন্তরঙ্গতার সখ্যের অনুভবের এক বিরাট পরিষেবা আমরা দিই, যে যৌনতার, যে কাজের, কোনো মূল্য সমাজ আমাদের দেয় না । পুরুষ এই প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসতে পারে । গোপন হলেও তার একটা স্বীকৃত কাঠামো আছে, বিশাল একটা ব্যবসা আছে । কোনও মেয়ের যৌন কামনা মেটাতে যৌনকর্মীদের পরিষেবা গ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই । তার স্বধীন যৌনতার কোনো স্বীকৃতিই নেই । সে শুধু যৌন ব্যবসায় জড়াতে পারে নিজেই যৌনকর্মী হয়ে ।

মেয়েরা যৌন ব্যবসায় আসে কেন ?

অন্য আর পাঁচটা পেশায় মানুষ যে কারণে যায়, সে-ভাবেই যৌন ব্যবসায় অধিকাংশ মেয়েই আসে পেটের তাড়নায় । যে বিহারী মজুর কলকাতায় রিকশা চালায় অথবা যে বাঙালী শ্রমিক বম্বের মিলে ঠিকা কাজ করে, আমাদের গল্প তার থেকে আলাদা নয় । কেউ কেউ বিক্রি হয়ে চলে আসে । বেশ কিছু বছর মালকিনের দাসী হয়ে শ্রম বিক্রি করে ধীরে ধীরে ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা পায় । আবার বেশ কিছু মেয়ে জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এখানে এসে পৌঁছায় -- অনেক সময়ই পুরোপুরি সব না জেনে, পুরোপুরি নিজের ইচ্ছেতে নয় ।

কিন্তু একথা বারবার মনে রাখা দরকার যে, সাধারণভাবে মেয়েরা কি পরিবারে কি পরিবারের বাইরে নিজের ইচ্ছেতে চলে না । মেয়েরা কি শুধুমাত্র যৌন ব্যবসায় ঢোকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ? বাবুর বাড়িতে চাকরি করতে যাওয়া, বিয়ে করা, সন্তানধারণ করা -- এর কোনো ক্ষেত্রেই তো মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা নেই । আমাদের সমাজে মেয়েদের, বিশেষত গরিব ক্ষমতাহীন পরিবারে, মানুষদের ইচ্ছে - অনিচ্ছে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না । এরও ওপর মেয়েদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ।
কিন্তু মেয়েরা তবু কেন এই পেশায় থাকতে বাধ্য হয় ? যৌনপেশা এক কঠিন পেশা । দিনে একাধিক পুরুষকে গ্রহণ করার কাজ এক যান্ত্রিক পরিশ্রম । এর খাটুনি লেদ চালানো বা চাষের কাজের চেয়ে কম নয় । কাজেই এর মধ্যে যৌনকর্মীর যৌন তাড়না পরিতৃপ্ত হওয়ার গল্প নিছক গল্পই । এছাড়া থাকে নানান সংক্রমণের সম্ভাবনা, বারবার অবাঞ্ছিত গর্ভমোচনের যন্ত্রণা আর ঝুঁকি । অধিকাংশ পল্লীতেই ভিড় বেশি । মেয়েরা বেশির ভাগই গরিব, পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, বাথরুম পায়খানার ব্যবস্থা কম, দালালদের অত্যাচার, পুলিশের জুলুম চলতেই থাকে । এই সবকিছুর ওপর জড়িয়ে থাকে সামাজিক অবমাননা -- নষ্ট হওয়ার ছাপ । স্বীকৃতিহীন শিশুর মা হওয়ার অসুবিধে, বড় হওয়ার পথে তাদের নানা লাঞ্ছনা এবং সেই থেকে মায়ের ওপর তাদের রাগ । মেয়ে- সন্তান হলে একটুকু বয়স থেকেই তাকে নিয়ে চিন্তা । যে পরিবারে বিয়ের কাঠামোয় আমাদের কোনো স্বীকৃতি নেই , মেয়েকে সেই নিরাপত্তা যোগাড় করে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা আত্মগ্লানির, শারীরিক মানসিক কষ্টের । এ-এক নির্মম জগৎ । আমরা কি অবাধ যৌনতা চাই ? না, আমরা চাই স্বাধীন যৌনতা । 'অবাধ যৌনতা' কথাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যথেচ্ছাচার, অসংযমের ইঙ্গিত । এই বিষয়গুলো প্রথাগতভাবে আলোচনা করে, অবদমন করে, সমস্যার সমাধান আমাদের সমাজে হয়নি, হবেও না । আমরা বিশ্বাস করি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, সব ধরনের স্বাধীনতার পেছনেই থাকে দায়িত্ববোধের প্রশ্ন,, অন্যের অধিকার স্বীকার করা, সম্মান জানানোর প্রশ্ন । এই ভিত্তিতে যৌন স্বাধীনতা এলে

তাতে অসংযমের প্রশ্ন আর-পাঁচটা বিষয়ের মতই সমান গুরুত্ব পাবে । আমরা চাই যৌনতাকে চেপে রেখে রগরগে আলোচনার বাইরে প্রকাশ্য, স্বাভাবিক, সাবলীল বিতর্ক ।

যদি প্রশ্ন ওঠে -- স্বাধীন যৌনতা কী ? আমরা বলব এই মুহূর্তে তার গোটা ছবি আমাদের সামনে নেই । আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই । পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রমিকরা যখন দাবি দাওয়া নিয়ে লড়েছে, কালো মানুষ যখন সাদাদের বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তখন নতুন যে ব্যবস্থা তারা চায়, তার পুরো ধারণা তারা কেউই দিতে পারেনি । সেই ছবি আগে নির্দিষ্ট কোনও ভবিষ্যৎ হয়ে তৈরি হয়ে থাকে না -- আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই তৈরি হয় । আমরা আজ শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এই যৌনতা নারী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করবে । এতে সমানভাবে যোগদানের, হ্যাঁ এবং না বলার অধিকার, সবার থাকবে । এতে পাপবোধের কোনো কারণ এবং অত্যাচারের কোনো জায়গা থাকবে না ।

আমরা আজ এক আদর্শ সমাজে বাস করি না । সব দিকে আদর্শ কোনো সমাজ কোন্ পথে কবে আসবে আমরা জানি না । আমরা আশা করি এমন কোনো এক দিন আসবে, যে-দিন যৌন ব্যবসায়ের প্রয়োজন ভেতর থেকেই ঘুচে যাবে । আমরা আজ শুধু এর অসাম্যের দিকগুলো তুলে ধরতে, যথাসাধ্য দূর করতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি ।

আমাদের আন্দোলন কোন পথে ?

আমরা মনে করি আমাদের আন্দোলনের দুটো দিক আছে । একদিকে সমাজের বহু মিথ্যা নীতিবোধ, অসম বিধান, অত্যাচারী দর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, যা দীর্ঘদিন ধরে বহু আলাপ আলোচনা, প্রচার, প্রতিবাদ, মত-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে ; অন্যদিকে এই মূল্যবোধের আশ্রয় নিয়ে আমাদের ওপর প্রতিদিন যে অত্যাচার চলে তার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে । যে মালকিন ন্যায্য পাওনা দেয় না, যে দালাল ঠকায়, যে মাস্তান গুন্ডামি মারধর করে, যে পুলিশ ইচ্ছেমতো আমাদের চুলের মুঠি ধরে জুলুম চালায় -- তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে । এই কাজ শুরু হয়েছে । আজ পল্লীতে আমাদের মেয়েদের সংগঠন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ।

পুরুষ যৌনকর্মীরাও আমাদের পাশে

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি মূলত মহিলা যৌনকর্মীদের নিয়েই শুরু হয়েছিল। আজ আমাদের সংগঠনে পুরুষ যৌনকর্মীরাও যোগ দিয়েছেন । এই পুরুষ যৌনকর্মীরা সমকামী পুরুষ খদ্দেরদের যৌন পরিষেবা দেন । যেহেতু সমকাম আমাদের সমাজে আরও অস্বীকৃত, এই শ্রমিকদের অবস্থা অনেকদিক থেকে আরও সমস্যাসংকুল ।

আমরা চাই যৌথ আন্দোলনের মাধ্যমে এঁদের স্বীকৃতির বিষয় সমানভাবে উঠে আসুক । যৌনকর্মীদের আন্দোলন চলছে । এ আন্দোলন থামবে না । আমরা বিশ্বাস করি এই আন্দোলন যে-প্রশ্নগুলো তুলে ধরেছে তা মূলত যৌনকর্মীদেরই শুধু নয়, সকলের -- যে মানুষ নিজের ভেতরে এবং বাইরে অবদমনকে প্রশ্ন করে, অসাম্য অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্ত এক পৃথিবী চায়, এই আন্দোলন তাদের সবার । যৌনতা আমাদের মনের শরীরের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, একে অস্বীকার করা মানে অপূর্ণতাকে মেনে নেওয়া এবং এই নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে আরও নানা অসাম্যকে টিকিয়ে রাখা । আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ইতিহাস বোধহয় আমাদের একথাই শেখায় যে, পরিবর্তন সহজ নয় । ক্ষমতা-ধ্যানধারণার যে কঠিন কাঠামো কাজ করে, যে-শেকড় আমাদের গভীরে ঢুকে যায়, তার সঙ্গে সহজে জেতা যায় না -- লড়ে যেতে হয় । এ লড়াই শুধু জীবন ও জীবিকার লড়াই নয় ।এ লড়াই নারী-পুরুষের অসাম্যের বিরুদ্ধে পরিবারতন্ত্রের অবিচার ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে -- এ লড়াই তাই এই সুস্থ স্বভাবিক জীবন ও পরিবার সৃষ্টির সপক্ষে; ন্যায় তথা সাম্যবাদের সপক্ষে বলিষ্ঠ ‘জেহাদ’ । এ-লড়াই তাই আমাদের সকলের । আর এ লড়াই আমাদের জিততেই হবে ।

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত

গণিকার অধিকার

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষণে গণিকা বা বেশ্যাদের এখন নাম দেওয়া হয়েছে 'যৌনকর্মী ', আর সম্প্রতি তারা খবরের শিরোনামে আসছে । তারা যৌনবস্তু হিসেবে খবর না হয়ে একটা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য খবরে আসছে এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ । অন্তত আলোচনার একটা বিষয় হিসেবে 'পতিতা'দের জায়গা থেকে এটা একটা উত্তরণ ।

১৪ - ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত যৌনকর্মীদের জাতীয় সম্মেলনের ব্যাপারটা ভারতের গণমাধ্যমে সর্বত্র খবর হিসেবে এসেছে । এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা হল পশ্চিমবঙ্গের যৌনকর্মীদের এক সংগঠন 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' (সংক্ষেপে শুধু 'দুর্বার') । কনফারেন্সে যে দাবি উঠে এসেছে তা হল বেশ্যাদের 'শ্রমিক' হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং তাদের ব্যবসাটাকে একটা 'পেশা'-র স্বীকৃতি দিতে হবে । এই দাবি কি সত্যিই এই মেয়েদের নিজস্ব দাবি ? নাকি তাদের প্রতি আপাত-সহানিভূতিশীল কোনো বাইরের শক্তি তাদের মুখে এই দাবি বসিয়ে দিয়েছে ? সে যাই হোক, দাবিটা তোলা হয়েছে, এবং এই দাবিটা এমন একটা প্রশ্ন যার উত্তর সমাজকে এবার দিতে হবে ।

কে না জানে নাম বদলালেই কোনো জিনিসের অন্তর্বস্তু বদলাবে তা বলা যায় না । বেশ্যাদের 'যৌনকর্মী' বলে ডাকলেই তারা শ্রমিকের সামাজিক অবস্থান বা অধিকার পেয়ে যায় না । সুতরাং কনফারেন্স যে দাবিটা তুলেছে তার তলায় লুকিয়ে আছে এই মৌলিক প্রশ্ন ঃ বেশ্যাদের কেন শ্রমিকের মর্যাদা দেওয়া হবে না ? তারা কি 'শ্রম' দিয়ে তাদের অন্ন উপার্জন করে না ? কারখানার বা ক্ষেতখামারের শ্রমিকের মতোই তারা কি তাদের দেহের উপজাত শ্রমশক্তি বিক্রি করে না ?

কিন্তু তাদের কাজ কি কোনোভাবে (সমাজের) উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ? নয়ই বা কেন ? একজন বেশ্যা কাজ করে নিজের এবং তার ছেলেমেয়ের অন্ন জোগায়, এমনকি অনেক সময় যে পরিবার সে ছেড়ে এসেছে তারও প্রতিপালন করে । কোন না কোনো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে তার আয়ের প্রতিটা পয়সা খরচ হয় । এ যদি উৎপাদন না হয় তবে আর উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে ?

সাধারণত বিতর্কের এই জায়গায় একটা অদ্ভুত হৈ চৈ হয় -- বিতর্ক তোলা হয় ঃ চোর-ডাকাত, মাদকপাচারকারী এবং অন্য সব অপরাধীরাও তো তাদের কাজ দিয়ে তাদের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখছে -- বেশ্যাদের কাজটার স্বীকৃতি দিতে হলে তাদের কাজেরও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ।

এটা অত্যন্ত পুরনো যুক্তি । মহাত্মা গান্ধি এই যুক্তির অবতারণা করেছিলেন । ১৯৩০-এর দশকে বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালে শরৎ ঘোষ নামক এক গান্ধিবাদী সংগঠক সেই জেলার বেশ্যাদের এক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন । তিনি যখন মহাত্মার মতামত জানতে চান, তখন গান্ধি বলেন -- এ কাজকে অনুমোদন দিলে 'চোর-ডাকাত'দেরও নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে দেওয়া উচিত । মহাত্মার মন্তব্য বেশ্যাবৃত্তিকে অপরাধ বা 'পাপকাজ' হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করে । এ ধরনের যুক্তি খুবই শোনা যায়, তাই যুক্তিটাকে খুঁটিয়ে দেখা দরকার ।

প্রথম বিষয়টা হ'ল এক অর্থে অপরাধীরাও শ্রমিক । মার্কস তো এতদূর অবধি বলেছেন যে, অপরাধীকে 'উৎপাদক' বলা যায় কেননা সে কেবল অপরাধই উৎপাদন করে না, তার জন্যই ফৌজদারী আইনের সৃষ্টি ..... সৃষ্টি গোটা পুলিশী ব্যবস্থা ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার, যা থেকে বাস্তব সম্পদ বৃদ্ধি পায় । মার্কসের ভাষার গঠনের গভীরতায় যে ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে তাতে একজন অপরাধীকে উৎপাদক বলার মধ্যে দিয়ে কিন্তু তার অপরাধমূলক কাজকে সমর্থন করা হচ্ছেনা, বরং এটাকে বাস্তব অবস্থার এক বিবরণ বলা যেতে পারে ।

কিন্তু বেশ্যাবৃত্তির মত সংবেদনশীল একটা বিষয় নিয়ে কেবল বাস্তব অবস্থার বিবরণে কি সন্তুষ্ট থাকা যায় ? অবশ্যই নয় । নৈতিকতার একান্ত প্রয়োজন দাবি করে বলে বিষয়টাকে তার নির্দিষ্ট, জটিল পরিপ্রেক্ষিতে খুঁটিয়ে দেখা হোক ।

প্রথমত বেশ্যা এবং চোর-ডাকাতের মধ্যে তুলনা করাটা ভুল । কেননা **একজন বেশ্যা কাউকে ঠকায় না বা কারোর কিছু হরণ করে না, বরং তারই আত্মসম্মান, সামাজিক পরিচয় হরণ করা হয় ।** দ্বিতীয়ত, কোনভাবেই বেশ্যাবৃত্তিকে অপরাধমূলক কাজ বলা যায় না । বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে নৈতিক যুক্তিগুলো হল নীতিবাগীশদের যুক্তি । শরীর হল পাপপুণ্যের একমাত্র আধার, এবং তাই শরীরকে কোনোভাবে 'দূষিত' করা চলবে না -- এটা যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য পিতৃতন্ত্রের বানানো এক নীতিশাস্ত্র । ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সাহিত্য থেকে এর সাক্ষ্য মেলে ।

এবার যৌনকর্মের জন্য পয়সা দেওয়ার প্রশ্নটাতে আসা যাক । পয়সার জন্য কি কারো শরীর বেচা উচিত ? প্রশ্নটা জটিল, এবং তার অন্ধিসন্দি খুঁজে দেখা দরকার । যদি কোনো নারী পয়সার বিনিময়ে শরীর বিক্রি করবে এটা স্থির করে, বা বিপরীত লিঙ্গের দুজন পরস্পরের কাছ থেকে যৌন আনন্দ ক্রয়-বিক্রয়ে রাজি হয়, তবে তাকে 'অনৈতিক' বলা সত্যিই কঠিন । একটা যুক্তিসংগত কথা হল যে, মানুষের শরীর একান্তভাবে তার ব্যক্তিসত্ত্বার অংশ এবং তাতে অপরের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয় । কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি সেটাই করতে রাজি হয়, তাহলে কোনো নৈতিক বা আইনি ফরমানে তার সে অধিকার খর্ব করাটাই বা কতটা উচিত ? এ প্রশ্নে অনেকরকম যুক্তি উঠে আসে, এবং আমাদের খুব জটিল ও বিতর্কিত জায়গায় পৌঁছতে হয় । যুক্তি ও প্রতি-যুক্তির লড়াইতে কেউ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই পারেন যে, বেশ্যাবৃত্তিতে কোনো ভুল বা 'অনৈতিক' কিছুই নেই ।

গোপন কর্মসূচী

প্রথমেই এটা পরিষ্কার করে বলে নেওয়া ভালো যে বর্তমান লেখক বেশ্যাবৃত্তির পুরোপুরি বিরুদ্ধে, কেননা এ বৃত্তি মানবতার অবনমন ঘটায় । রাসেল যেমন বলেছেন -- এ হল প্রবৃত্তিবিরোধী জীবন । জৈবিক, মানসিক, নান্দনিক এবং নৈতিক, যাবতীয় রকম মৌলিক মানবতার বিরোধী এটি । একজন বেশ্যার শরীর কেবলমাত্র হিংস্রতার একটা 'দৃশ্য' নয় বরং তার ব্যক্তিসত্ত্বা ও আত্মসম্মানবোধের ওপর হিংস্র আক্রমণের 'ক্ষেত্র'ও বটে । কিন্তু এখানে একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে । শোষণমূলক এই ব্যবসায় অবনমন রয়েছে সেই ছুতোয় এ ব্যবসায় যারা রয়েছে তাদের শ্রমিকের মর্যাদা অস্বীকার করা যায়না । যে সাফাইওয়ালা মানুষের মলমুত্রের পাত্র বহন করে তার কাজ তার আত্মমর্যাদার ওপর এক অত্যাচার । কিন্তু তা বলে কি এই সাফাইওয়ালা একজন শ্রমিক নয় ? সাফাইওয়ালার কথা তোলার মানে এই নয় যে, বেশ্যাবৃত্তি ও মলমূত্র পরিষ্কার করার কাজ দুটো এক । যে মানবিক অবনমন একজন বেশ্যার জীবনে অন্তর্লীন হয়ে থাকে তা আরো ভয়ানক, কেননা তা সব সময়ে ক্ষত সৃষ্টি করে । পূর্বোক্ত কনফারেন্সে যে মূল লেখাটা পাঠ করা হয় তাতে বেশ্যাবৃত্তি আর-পাঁচটা সামাজিক বৃত্তির সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে । কলঙ্ক মোছার ছল করে এ বক্তব্য প্রান্তবাসিনীদের জীবনে যন্ত্রণাময় ক্ষতটাকেই ঢেকে দিতে চাইছে । আর কে না জানে বেশ্যারা হল সমাজের অন্তেবাসীদের মধ্যেও অন্ত্যজ ।

কনফারেন্সের যে মূল লেখাটার কথা বলছি তাতে বলা হচ্ছে, বেশ্যাবৃত্তি হল সমাজকে এক ধরনের 'সেবা' দেওয়া । এতে বলা হয়েছে --- 'যৌনকর্মের বাইরেও আমরা বহুবিধ যৌনসুখ দিয়ে থাকি যে-সেবার গুরুত্ব স্বীকৃতই হয় না ।' বর্তমান বিশ্বে বেশ্যাবৃত্তিকে 'আংশিক সময়ের স্ত্রী ' বলার যে প্রবণতা, তার সঙ্গে এ বক্তব্য খুব খাপ খেয়ে যায় । এতে তর্ক করা হয়েছে যে একজন বেশ্যা তার খদ্দেরকে যৌনসুখের সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠতা, স্পর্শ ও সহমর্মিতা' দেয়, যে খদ্দের হয়তো কোনো প্রবাসী মজদুর, বা হয়তো কোনো অবিবাহিত বা বিপত্নীক, বা তার যৌনজীবনে কোনোভাবে অসুখী ।

সত্যি কথা বলতে কি এমন সংজ্ঞার মধ্যে কিছু সত্যি তো রয়েছে । কিন্তু যেভাবে এটা রাখা হচ্ছে তার ভেতর একটা তঞ্চকতা আছে । লেখাটার লেখকরা নিশ্চিতভাবেই নিজেরা বেশ্যা নন, তারা বেশ্যাবৃত্তির উকিল । তাঁদের উচিত ছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ঐসব মেয়েদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখা যে তারা অসুখী মানুষদের সেবা করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বেশ্যাবৃত্তির লাইনে এসেছে কি না । সবাই জানে যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার আগেই এইসব মেয়েরা দেখে তাদের এই ব্যবসায় টেনে নামানো হয়েছে -- তাদের জেনেবুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া তো দূরের কথা । এবং তার খদ্দেরের সঙ্গে তার প্রথম যৌনকর্মের অভিজ্ঞতা যখন হয় তখন তার প্রায় অজ্ঞান অবস্থা । শরীরের এ ক্ষত ক্রমশ শুকিয়ে যায় কিন্তু তার বাকি জীবনটা জুড়ে প্রবল অধোগমনের চেতনা তাকে ছিঁড়ে খায় ; প্রতিটা সূর্যোদয়ে তার মধ্যে এই 'অভিশপ্ত' জীবন ছেড়ে বেরোনোর নতুন ইচ্ছে জন্ম নেয় । 'সেবা' করার ব্যাপারটা তাই অন্যের বসানো ধারণা । জবাই করা পশুকে পবিত্র বলার মতোই নারীমাংসের ব্যবসাকে সেবার মহিমা দেওয়াটা ভন্ডামি । ভাষার কৌশলে এ হল চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারকে স্বেচ্ছাবরণে মহিমান্বিত করা ।

কোনো এক অতীতে গণিকাদের এক অংশের বিনোদিনীর ভূমিকা সামাজিক স্বীকৃতি পেত ও তাদের অধিকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুরক্ষিত ছিল -- এটা অনস্বীকার্য । কিন্তু এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যৌন-ব্যবসা তথা বেশ্যাবৃত্তি যেভাবে চলে সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার । কলকাতার সোনাগাছি বা বৌবাজারের গলির মেয়েরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের চরিত্র কোনো বসন্তসেনা বা বাসবদত্তা নয় । এ ব্যবসা এখন যেভাবে চলে তাতে উভয়পক্ষের সম্মতি বা ন্যায়সঙ্গত চুক্তির কোনও জায়গা নেই । আছে কেবল অত্যাচার -- নিষিদ্ধ পল্লীতে একমাত্র যে ভাষা চলে তা হল হিংসার ভাষা ।

দুর্বারের কনফারেন্স আপাতদৃষ্টিতে বেশ্যাদের হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে চাইছে, তার জন্য এ ব্যবসায় ন্যায়সঙ্গত আদানপ্রদান চালু করতে চাইছে, একে এক 'শিল্প' বা ইন্ডাস্ট্রির স্তরে তুলতে চাইছে । বেশ্যাদের সমাজের মূলস্রোতে, পারিবারিক জীবনে, ফিরিয়ে আনার কথাকে এরা ব্যঙ্গ করছে, কেননা 'সমাজ কখনো আমাদের বেশ্যা পরিচয় ভুলতে দেবেনা ।' তাই যদি হয় তবে এ বৃত্তিকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করলে দুর্বারের ভাষায় 'বর্তমান বৈষম্য এবং অবিচার' কেমন করে দূর হবে ? সমস্ত মানবিক সম্পর্কগুলোকে আর্থিক বিনিময়ে পরিণত করার যে প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তার প্রেক্ষিতে কি এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ফলে নারীর অবদমনের আরেক নতুন অধ্যায় রচিত হবেনা ?

শেষ কথা হল, এই সেবার ব্যাপারটা কি পুরুষদের সম্পূর্ণ পক্ষেই যায়না ? যদিও আমাদের সমাজে দু চারজন পুরুষ-বেশ্যা রয়েছে, তবু সাধারণভাবে বলা যায় স্বামী-পরিত্যক্ত, বিধবা, বা বিবাহিত জীবনে অসুখী মেয়েদের জন্য তো এমন 'সেবা'-র কোনো ব্যবস্থা নেই । কনফারেন্সের উপরোক্ত লেখাতে পুরুষ ও নারী বেশ্যাদের একইভাবে চিহ্নিত করে মূল ব্যাপারটাতে ইচ্ছাকৃত ধোঁয়াশার সৃষ্টি করা হয়েছে । পুরুষ বেশ্যারা নিজেরাই মিডিয়ার সামনে বলেছে যে তারা স্বেচ্ছায় দ্রুত অর্থোপার্জনের জন্য এ লাইনে এসেছে । যে মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনোরকম তোয়াক্কা না রেখে দেহ ব্যবসায়ে টেনে আনা হয়েছে তাদের সঙ্গে কোনো যুক্তিতেই এই পুরুষ বেশ্যাদের এক সারিতে রাখা যায় না ।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল মেয়ে বেশ্যাদের অনেকেই এরকম এক করে দেখার বিরোধিতা করছে । তাদের কেউ কেউ বলেছে - 'ওরা তো ছেলে । ওরা কারখানায় খেটে খেতে পারে -- সেখানে ওদের তো কেউ আমাদের মত যৌন নিপীড়ন করবে না ।' ওই মেয়েটিকে যদি সাংবাদিক প্রশ্ন করতেন যে তাদের পেশাটাকে সে একটা 'সেবা' বলে ভাবে কিনা, তবে তিনি নিশ্চয় এই ব্যবসাকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সেবাকার্য বলে এ পেশার মহিমা বাড়ানোর অত্যুৎসাহী প্রচেষ্টায় তার আপত্তির কথাই শুনতেন ।

সমাজে **একটা সত্যিকারের চাহিদা মেটাচ্ছে বেশ্যাবৃত্তি, এর একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজন রয়েছে - এ যুক্তি সবচেয়ে অনৈতিক ।** সমাজে সস্তা শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে সবসময়েই, সুতরাং কম দামে মজুর সরবরাহ করার জন্যই কি কিছু লোককে বাঁচতে হবে ? আর যৌনব্যবসাকে আইনসম্মত করলেই যৌন অপরাধ ও যৌন বিকৃতি কমবে -- এ দাবির সঙ্গেও একমত হওয়া শক্ত । যেসব দেশে বেশ্যাবৃত্তি আইনসম্মত বা এ নিয়ে বিশেষ সামাজিক ধিক্কার নেই সেসব দেশের অভিজ্ঞতা এই মতকে সমর্থন করেনা । আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধেও যৌন কেলেঙ্কারির বিচার হয় ।

স্ববিরোধ

তাহলে আমরা কোথায় পৌঁছলাম ! আমরা বলছি, বেশ্যাদের শ্রমিকের মর্যাদা চাই, কিন্তু একই সাথে বেশ্যাবৃত্তি আইনসম্মত করা বা তাকে ন্যায্য ব্যাপার বলার আমরা বিরোধিতা করছি । আমাদের বক্তব্যে নিশ্চিতভাবে স্ববিরোধের আভাস রয়েছে -- এবং এ স্ববিরোধ আমাদের সামাজিক বাস্তবতা প্রসূত । বেশ্যাদের শ্রমিকের মর্যাদা দিলেই তাদের ব্যবসায় অন্তর্নিহিত যে অমানবিকতা রয়েছে তাকে ন্যায়সঙ্গত বলতে হয় না । এবং এই ব্যবসা চলতেই থাকবে -- একথা বলারও দরকার পড়ে না । আমরা যখন বন্দীদের অধিকার দাবি করি তখন নিশ্চই আমরা বলি না, যে অপরাধে সে বন্দী সেটাকেও আইনসম্মত ঘোষণা করা হোক । অধিকারের যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, শুধুমাত্র আইনসিদ্ধতা সেখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়, মানবিক প্রশ্নটা তার চাইতে বড় । আমরা আশা করি শ্রমিকের অধিকার পেলে এইসব নারীদের মৌলিক মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হবে, এবং এই একই পদ্ধতির ধারাবাহিকতায় এই শোষণমূলক ব্যবসারও অবসান হবে । আমরা খুব ভেবেচিন্তেই বলছি 'শেষ' হবে, 'উঠিয়ে দেওয়া' হবে বলছি না । 'উঠিয়ে দেওয়া'-র মধ্যে জোর খাটানোর যে ব্যাপার থাকে সেটা আমরা চাই না, সমর্থন করি না । যদি শ্রমিকের মর্যাদা পাবার দাবি থেকে এ ব্যবসার বাইরে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারে উত্তরণ না ঘটে, তবে এই আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত হিংস্র এক ব্যবসার পক্ষে ওকালতিতে পর্যবসিত হবে ।

আচ্ছা, শ্রমিকের অধিকার বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি ? ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার ? এই প্রশ্নটার উত্তর ভেবে দেখা দরকার । আমাদের কাছে বেশি জরুরী হল আইনী ব্যবস্থা ও বেআইনী মস্তান-মাফিয়া-পুলিশ ব্যবস্থা দিয়ে যেন এই মেয়েদের ওপর অত্যাচারটা না চলে । সরকার এদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক, যাতে এদের ছেলেমেয়েরা বিনা বাধায় স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করুক । কোনো বেশ্যা যখন অত্যাচার বা হয়রানির অভিযোগে পুলিশের কাছে যাবে তখন পুলিশ তার অভিযোগ নথিভুক্ত করুক এবং যারা রাস্তার মেয়েদের নানাভাবে উত্যক্ত করার অভ্যাস করে ফেলেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক । স্থানীয় ক্লাবগুলোর অনুষ্ঠানে বেশ্যাদের ছেলেমেয়েদের সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোক । মহিলা কমিশন এইসব মেয়েদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে কথা বলুক, নারীদের ওপর হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধিতার আন্দোলনে এদের আহ্বান করা হোক । আমরা এমন পরিবেশ তৈরি করি যেখানে এদের যেন আর নষ্ট মেয়ে বলে ভাবা না হয় ।

শেষত, বেশ্যাদের অভিজ্ঞতা বলে ওপরে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা কিন্তু বর্তমান লেখকের কল্পিত কিছু নয় । লেখক কলকাতার বেশ্যাদের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার প্রোগ্রামে যুক্ত ছিলেন । ১৯৯৮ সালে মতাদর্শগত বিরোধের কারণে লেখক ওই প্রকল্প থেকে সরে আসেন । তাঁর ছাত্রীদের কাছে তিনি যা শুনেছেন তিনি সেটাই এভাবে লিখেছেন ।

(ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী লেখার বাংলা অনুবাদ । লেখকের অনুমতি নিয়ে প্রকাশিত । অনুবাদক ঃ জয়ন্ত দাস)

পাতা ২৭-৫৭ র জন্য এখানে ক্লিক করুন

http://www.utsamanush.com/BookCollection/JOUNO_SPL_05-pp27-58.pdf